MAP OF INDIA.

# [স]চিত্র ভারত ভ্রমণ।

# PICTORIAL TOUR ROUND INDIA:
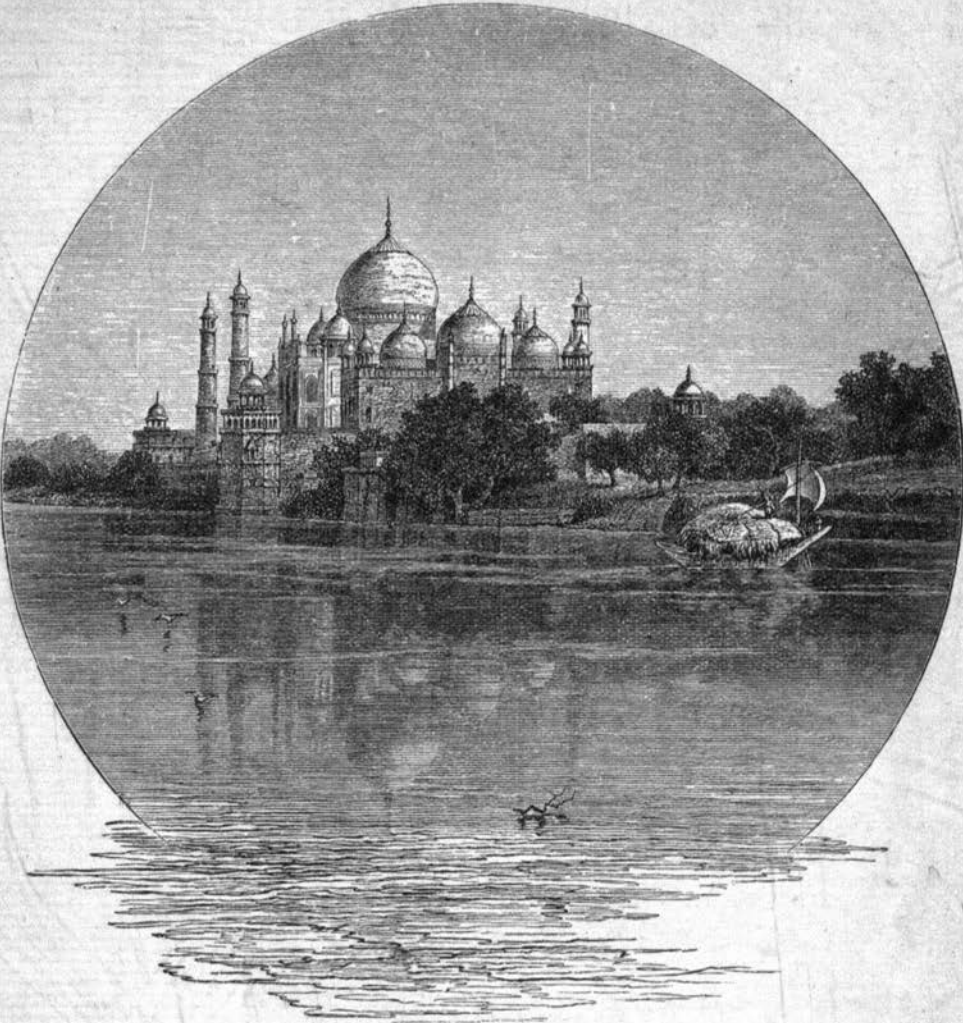
আগ্রার তাজমহল।

(First Edition 1,000 Copies.)

Haranacandra Rakhsa

CALCUTTA:
THE CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY.

1897.
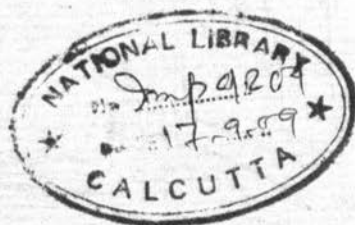
সচিত্র

# ভারতভ্রমণ।

ভারতবর্ষ অতি রমণীয় দেশ; এই দেশের বিষয় দেশবাসীদিগকে সবিস্তারে জ্ঞাত করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। বহুশত বৎসরকাল যাত্রিরা পদব্রজে ভ্রমণ করত কল্পিত নানা তীর্থস্থান দর্শন পূর্ব্বক দেশের বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিত। এক্ষণে রেল-পথ হওয়াতে ভারত-ভ্রমণ বড় সহজ হইয়াছে। তথাপি অতি অল্প ভারতবাসী সমগ্র দেশ ভ্রমণ করিয়াছে; বহুসংখ্যক লোক জন্মাবধি কখনও নিজ জন্মস্থানের বা জন্মনগরের বাহিরে যায় নাই। কলিকাতা সহরেই এমন লোক আছে, যাহারা কখনও হাবড়া যায় নাই। এই পুস্তকে যে সকল চিত্র দেওয়া গেল, তাহা দ্বারা লিখিত বিষয় বুঝিতে অনেক সুবিধা হইবে। কল্পনাপথে আমরা সমস্ত ভারতবর্ষে ভ্রমণ করত, যেখানে যে যে উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া যাইব। তাও বলি, ভারতে বর্ণনার যোগ্য অনেক বিষয় আছে, সে সমস্তের বিবরণ লিখিতে গেলে অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত অপেক্ষাও বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়িবে। অতএব অনেক প্রধান নগরের বিষয়ে কিছুই বলা হইবে না, অথবা সংক্ষেপে কিছু কিছু বলা হইবে মাত্র। এ কথা মধ্য-ভারত বা দাক্ষিণাত্যের বিষয়ে খাটিবে। এরূপ করিবার প্রধান কারণ চিত্রের অভাব, কারণ চিত্রের অভাবে লিখিত বর্ণনা অনেক স্থলে সহজে বোধগম্য হয় না।
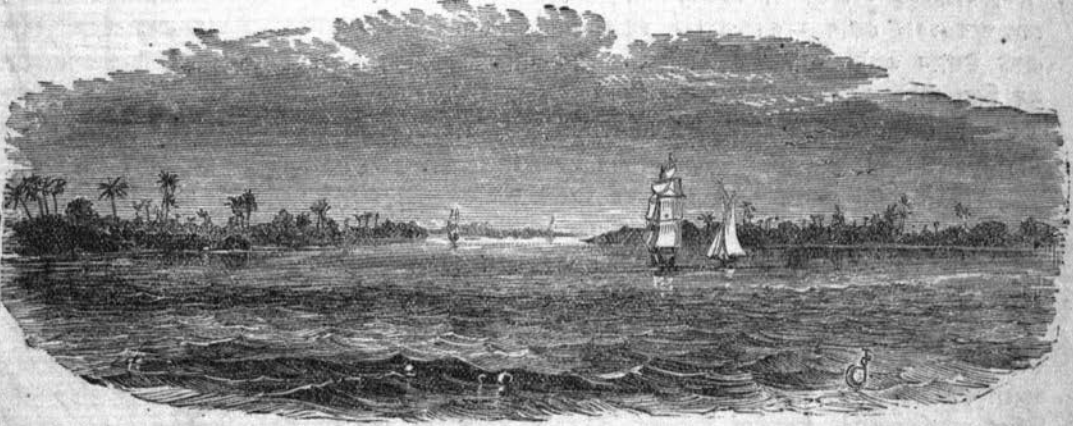
## ভাগীরথী নদী।

এক্ষণে বঙ্গোপসাগর দিয়া অনেক বড় বড় ধুঁয়ার জাহাজ কলিকাতায় আইসে। মনে কর, আমরা যেন তাহার এক খানিতে করিয়া বঙ্গোপসাগর হইতে গঙ্গা উজাইয়া যাইতেছি। যেখানে ভাগীরথী সাগরে গিয়া পড়িয়াছে, সেই স্থানকে ভাগীরথীর মুখ বলে। এখানে আরও একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক; ভাগীরথীকে ইংরাজিতে হুগলি-নদী বলে। গঙ্গার মুখের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে, জাহাজের পাশ দিয়া দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই, জলের বর্ণ এক্ষণে অনেকটা সবুজ; খানিক পূর্ব্বে কিন্তু ঘন নীল ছিল। গঙ্গার মুখের কাছে আসিতে আসিতে পাছে নাবিকেরা পথ ভুলিয়া যায়, এজন্য সেখানে এক খানি জাহাজ দিবারাত্র নঙ্গর ফেলিয়া থাকে; তাহার নাম "আলোক জাহাজ।" এই জাহাজের আলোক দেখিয়া কলিকাতা গমনাভিমুখী নাবিকেরা পথ ঠিক করিয়া লয়। যেখানে আলোক জাহাজ থাকে, সে স্থান কলিকাতা হইতে ৭০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি ছোট ছোট জাহাজ গঙ্গার মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাতে "পাইলট" নামে পথ-দর্শকেরা থাকে, কলিকাতায় যে জাহাজ আইসে, পাইলট নামক পথ-দর্শক সেই জাহাজে উঠিয়া পথ দেখাইয়া জাহাজখানি নিরাপদে কলিকাতার ঘাটে

লইয়া আইসে। গঙ্গার সাগর-সঙ্গম স্থান নাবিকদিগের পক্ষে বড় জটিল, সুতরাং বিপদসঙ্কুল। এই জন্য যাহারা নানা খালের গতি জানে, এমন পথ-দর্শকের প্রয়োজন। যতই স্থলের নিকটবর্ত্তী হই, ততই জল ঘোলা দৃষ্ট হয়। বড় বড় ইঞ্জিনিয়র সাহেবেরাই হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, গঙ্গা দিয়া প্রতিদিন এত মাটী ও বালি জলের সঙ্গে সমুদ্রে গিয়া পড়ে যে, তাহা জাহাজে করিয়া লইয়া যাইতে গেলে, ১৫০০ শত বড় বড় জাহাজের আবশ্যক। এই জন্য দক্ষিণ দিকে ক্রমেই গঙ্গা ভরাট হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে কলিকাতার উজানে ২০ ক্রোশ পর্য্যন্ত জাহাজ যাওয়া আসা করিত, এখন আর তাহা হয় না।

বঙ্গোপসাগর দিয়া গঙ্গার মুখে আসিতে গেলে, প্রথমে একখণ্ড স্থলভূমি দৃষ্ট হয়; ইহা সুন্দরবনের এক অংশ ও সাগর দ্বীপের দক্ষিণ সীমানা। এই স্থলভাগের যে অংশ সমুদ্রের দিকে, তাহা ঘন জঙ্গলময়, ও তাহাতে এত নালা ও খাল যে, দেখিলে চক্ষু স্থির হয়। এখানে বাঘ অপর্য্যাপ্ত। এখানে স্থায়ীভাবে লোকে বাস করে না। কেবল কাঠুরিয়ারা কাষ্ঠ কাটিতে যায়। এখানকার সুন্দরী কাষ্ঠ কলিকাতায় বিক্রয় হয়। এই জঙ্গলে গ্রীষ্ম কালে অনেক মধুচক্র হইয়া থাকে, লোকেরা বাঘের ভয়ে বন্দুক সঙ্গে করিয়া নিয়া মধুচক্র আহরণ করে। অনেক লোক এই ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে সাগরদ্বীপে এক প্রকাণ্ড পৌষমেলা হয়। লোকের বিশ্বাস যে, সে কালে ভগীরথ গঙ্গা আনিয়া সগর রাজার ৬০,০০০ সহস্র পুত্রকে উদ্ধার করেন। এই ঘটনার স্মরণার্থ প্রতি বৎসর সাগরদ্বীপে মেলা হয়। এই স্থলে, সেই মেলার সময়ে, পূর্ব্বে মানত রক্ষার জন্য স্ত্রীলোকেরা সাগরে ছেলে ফেলিয়া দিত, হাঙ্গর ও কুম্ভীরে সেগুলিকে উদরসাৎ করিত। লর্ড বেন্টিঙ্কের সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই নৃশংস কাণ্ড বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

গঙ্গার সাগর-সঙ্গমস্থল এমন প্রশস্ত যে, কোন দিকেই কূল দেখা যায় না। কিন্তু ক্রমেই অপ্রশস্ত হইয়া আসিয়াছে। সাগরদ্বীপে একটী আলোকালয় স্থাপিত আছে। ইতিপূর্ব্বে আলোক জাহাজের কথা বলিয়াছি; ইহার যে উদ্দেশ্য, আলোকালয়েরও সেই উদ্দেশ্য। গঙ্গা দিয়া কলিকাতা অভিমুখে আসিতে গেলে প্রথমে যে পাকা বাটী দৃষ্ট হয়, সে সাগরদ্বীপের আলোকালয়। কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার জলপথে ২০ ক্রোশ, কিন্তু রেল-পথে ১৫৷৷০ ক্রোশ মাত্র। পুরাতন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জাহাজ আসিয়া এই স্থানে নঙ্গর করিত। ইহার একটু উজানে একটা ভয়ানক চড়া আছে, তাহাকে নাবিকেরা জেমস্ ও মেরী বলে। দামোদর ও রূপনারায়ণ নদ দিয়া বালি আসিয়া এই চড়া হইয়াছে। এই চড়ায় জাহাজের তলা ঠেকিলে, জলস্রোত বেগে আসিয়া জাহাজ উল্টাইয়া ফেলে, তাহাতে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে বড় বড় জাহাজ ডুবিয়া যায়। এই প্রকারে অনেক জাহাজ মারা গিয়াছে।

ভাগীরথী দিয়া উজাইয়া যাইতে যাইতে অনেক জাহাজ আসিতে যাইতে দেখা যায়; কতক বড় বড় ধূঁয়ার জাহাজ, আবার কতক সে কেলে পাইলের জাহাজ; ছোট ছোট ধূঁয়ার জাহাজে এগুলিকে টানিয়া লইয়া যায়। বড় বড় দেশী নৌকাও বিস্তর দেখা যায়। এই সকল নৌকা করিয়া লোকে খড়, কাষ্ঠ ও ইষ্টক লইয়া কলিকাতায় যায়।

যতই উজান দিকে যাওয়া যায়, ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী স্থান ততই সমৃদ্ধিশালী বোধ হয়। বৃক্ষ, ধান্যক্ষেত্র, লোকালয়, তালবৃক্ষ ও বাঁশের ঝাড় বিস্তর চক্ষে পড়ে। "অবশেষে কলিকাতা সহরের সীমানায় পঁহুছিলে অকস্মাৎ অনপেক্ষিত সমৃদ্ধি নয়ন-পথে আসিয়া উপস্থিত হয়। জাহাজের সুদীর্ঘ বহর। তাহারই সম্মুখভাগে মুচিখোলার চিত্রিত অট্টালিকারাজি, গঙ্গাতীরে উচ্চ দুর্গ, তৎপরেই কলিকাতার সরকারী বাটী, ও গির্জ্জার চূড়া, এবং গুম্বুজ; এ সকলে যেন দল বাঁধিয়া চক্ষের সম্মুখে আপনাদের সমবেত-সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দেয়। দর্শক অমনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি অট্টালিকাময় নগরাভিমুখে যাইতেছেন।"

## কলিকাতা।

**ইতিহাস।** ভারতের বর্ত্তমান রাজধানী কলিকাতা মহানগরী, ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে স্থিত; সমুদ্র হইতে ৪০ ক্রোশ। নগরের দক্ষিণ প্রান্তে কালীঘাট নামক স্থানে কালীর এক মন্দির আছে; এই কালীঘাটের নামানুসারে রাজধানীর নাম কলিকাতা হইয়াছে।

১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তৎকালের ইংলণ্ডীয় রাজার নামানুসারে এই দুর্গের নাম ফোর্ট উইলিয়ম রাখেন। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা আরঙ্গজেবের পুত্র আজিমের নিকট হইতে গোবিন্দপুর ইত্যাদি তিন খানি গ্রাম ক্রয় করেন। এখন যেখানে কেল্লা, সেই খানে গোবিন্দপুর ছিল।

১৭০৭ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা মান্দ্রাজের অধীন ছিল, ঐ সালেই স্বতন্ত্র রাজধানী বলিয়া গণ্য হয়।

১৭৪২ সালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যন্ত অত্যাচার হয়। তাহাদের অত্যাচার হইতে নগর রক্ষা করিবার
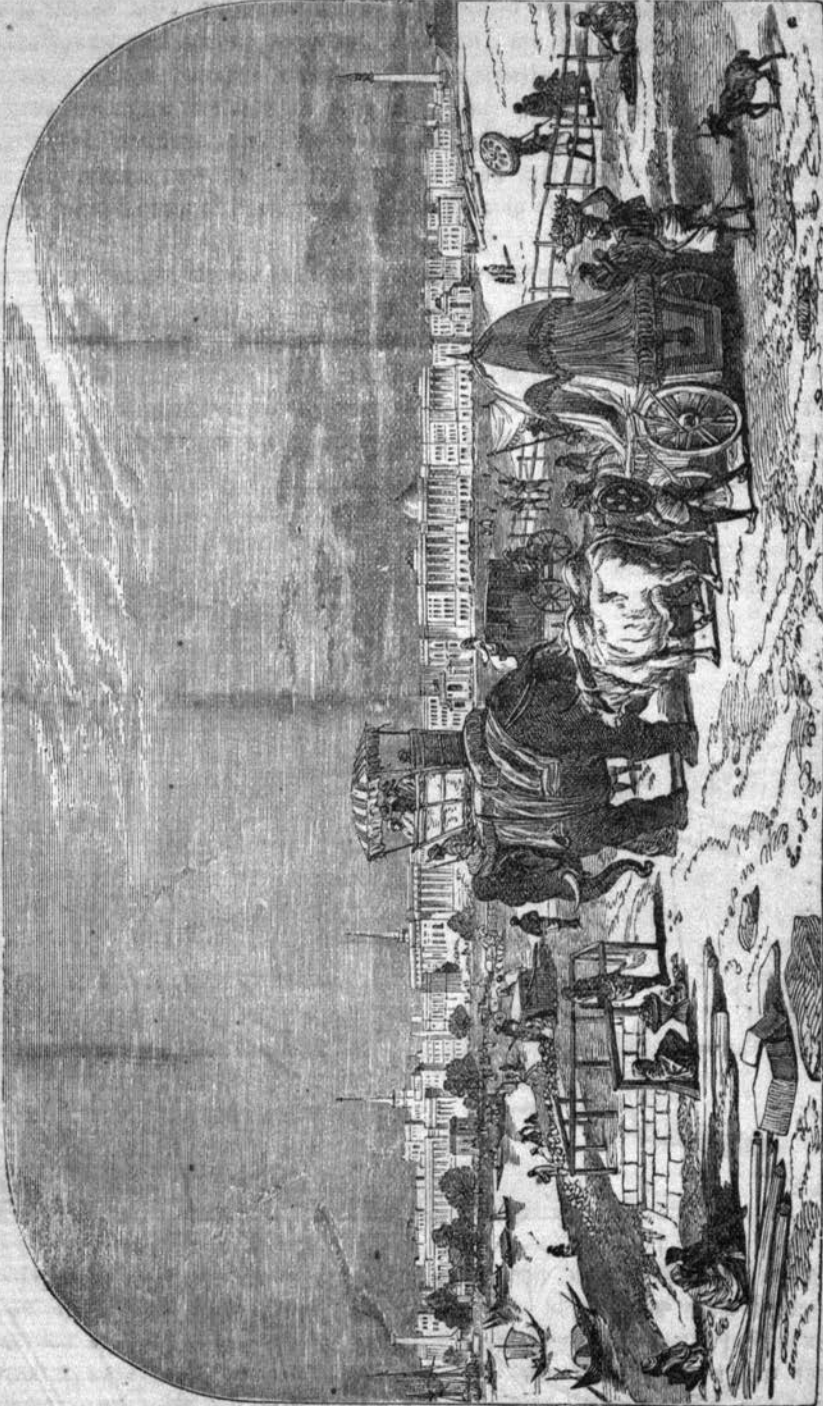
রবাসী দেশীয় লোকেরা ইংরাজদের অনুমতিক্রমে মহারাষ্ট্র খাত নামক গভীর খাত খনন করেন। ১৭৫৬ সালে
ঙ্গালার নওয়াব সিরাজ-উদ্দৌলা কলিকাতা নগর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। নগর লুণ্ঠনের পর নওয়াবের

কর্ম্মচারীরা ১৪৬ জন ইংরাজকে "অন্ধকূপ নামে" একটা গুদামে বন্ধ করিয়া রাখে, পর দিন প্রাতঃকালে দ্বার খুলিয়া কেবল ২৩ জনকে জীবন্ত পাওয়া যায়। পর বৎসর ক্লাইব সাহেব কলিকাতা নগর পুনরায় অধিকার করেন। পরে পলাসির যুদ্ধে জয়লাভ হইলে ইংরাজেরা প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হয়েন। ক্লাইব সাহেব কলিকাতার বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন, কিন্তু ১৭৭৩ সালে উহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। এই বৎসর ওয়ারেণ হেষ্টিং ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হয়েন, কলিকাতা তাঁহার রাজধানী হয়। তদবধি কলিকাতা নগরের দিন দিন উন্নতি হইয়া আসিয়াছে। দুই শত বৎসরের নূ্যন কালের মধ্যে তিন খানি অজ্ঞাত গ্রাম এমন সমৃদ্ধিশালী মহানগরে পরিণত হইয়াছে যে, এমন নগর এশিয়া খণ্ডে আর আছে কি না, সন্দেহ।

লোকসংখ্যা।—১৮৯১ সালে কলিকাতা নগরে ও সহরতলিতে ৮৪০,১৩০ জন লোকের বাস ছিল। কলিকাতার পশ্চিম দিকে ভাগীরথীর অপর তীরে হাবড়া, এখানকার লোকসংখ্যা ১৩০,০০০। বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষ্যে অনেক লোক আশে পাশের নগর ও গ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রতিদিন রাত্রে গৃহে প্রত্যাগমন করে। এই জন্য রাত্রি অপেক্ষা দিবাভাগে কলিকাতার লোক সংখ্যা অনেক অধিক।

দেখিবার যোগ্য বিষয়।—কলিকাতা সহরে বা উপনগরে যে সকল দর্শনযোগ্য বিষয় আছে, তাহার কতকগুলির সংক্ষেপ বিবরণ দিতেছি। নগরের দক্ষিণ প্রান্তে অযোধ্যার মৃত নবাবের অট্টালিকাসমূহ, দেখিতে পরম

সুন্দর। মুচিখোলা হইতে উত্তর দিকে যাত্রা করিলে একটী মাঠ পাওয়া যায়, ইহাকে গড়ের মাঠ বলে। গড়ে মাঠের এক অংশে একটী সুন্দর বাগান আছে, ইহাকে ইডেন বাগান বলে। ইডেন বাগান গঙ্গার তীরেই গড়ের মাঠের পশ্চিমাংশের মধ্যস্থলে দুর্গ, মাঠের পূর্ব্বপ্রান্তে চৌরঙ্গী রোড, এই রাস্তার ধারে অতি চমৎকা বড় বড় বাড়ী আছে। দক্ষিণ প্রান্তে লাট পাদ্রির বড় গির্জ্জা, বিশপ উইলসনের যত্নে এই সুন্দর ও প্রক ভজনালয় নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। চৌরঙ্গির মধ্যস্থলে যাদুঘর, ইংরাজিতে ইহাকে মিউজিয়ম বলে। এই বাটীতে নানা দেশীয় নানা প্রকার মৃত প্রাণী বহু যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত আরও এত প্রকার দেখিব যোগ্য জিনিস আছে যে, বলিয়া শেষ করা যায় না। গড়ের মাঠের উত্তর দিকে বড় লাটের বাড়ী, ইংরাজি

ইহাকে গবর্ণমেণ্ট হৌস বলে। লর্ড ওয়েলেস্লীর আমলে এই চমৎকার বাটী নির্ম্মিত হয়। ইহার পশ্চিম দিকে বড় লাটের সেক্রেটারিগণের আফিস ও ছাপাখানার বাড়ী। এই সকল তেতালা বাড়ী বড় সুন্দর ও কলিকাতা নগরের শোভার সাতিশয় বৃদ্ধি করিয়াছে। আফিস বাড়ীর পরেই টাউন হল, ও হাইকোর্ট। ৪র্থ পৃষ্ঠায় হাইকোর্ট বাড়ীর চিত্র দেওয়া গেল।

গড়ের মাঠের উত্তরে ভাগীরথীর তীর দিয়া একটী প্রশস্ত পথ বরাবর উত্তর মুখে গিয়াছে। এই রাস্তার পশ্চিম দিকে জেটি ও মাল নামাইবার জন্য টিনের বড় বড় ঘর। পূর্ব্ব দিকে সওদাগরদিগের বড় বড় আপিস বাড়ী। লাট সাহেবের বাড়ীর পূর্ব্ব দিক দিয়া এক প্রশস্ত রাস্তা উত্তর মুখে লাল দীঘি পর্য্যন্ত গিয়াছে। লাল দীঘির পশ্চিম দিকে বড় ডাকঘর; এটী অতি সুন্দর বাটী। পূর্ব্বোক্ত রাস্তার দুই ধারে সুন্দর সুন্দর দোকান। গড়ের মাঠ হইতে উত্তর মুখে আর এক রাস্তা গিয়াছে, ইহার কতকটার নাম বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, বাকি অংশের নাম চিৎপুর রোড। এই রাস্তা অতি অপ্রশস্ত, কিন্তু ইহার দুই পার্শ্বে অগণ্য দোকান ও লোকের বাস। এই রাস্তা দিয়া এত লোক ও গাড়ী চলে যে, তত আর কোন রাস্তায় চলে কি না, সন্দেহ। ইহার আশে পাশে কেবল দেশীয় লোকের বাস। এই রাস্তার পশ্চিমে আর একটী উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ প্রশস্ত রাস্তা আছে, ইহার দক্ষিণাংশের নাম কলেজ ষ্ট্রীট ও উত্তরাংশের নাম কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীট, এই রাস্তার ধারে মেডিকেল কলেজ, সিনেট হৌস, প্রেসিডেন্সি কলেজ, হিন্দু-স্কুল, হেয়ার-স্কুল, লেডি ডফারিণ হাসপাতাল ও আরও অনেক বিদ্যালয় আছে। রাস্তার দুই ধারের বাটীর নিম্নতলে দোকান, অধিকাংশই পুস্তকের ও কাপড়ের দোকান; উপরে লোকের বাস। এই অঞ্চলে অনেক ভদ্র লোকের ও ছাত্রগণের বাস। এই রাস্তার পার্শ্বে দুই একটী পুষ্করিণী আছে। ইহারও পূর্ব্ব দিকে আর এক বহুদূরব্যাপী রাস্তাকে স্যারকুলার রোড কহে। গড়ের মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে জিরেটের পুল, এই স্থানে রাস্তার আরম্ভ; এই রাস্তার শেষ বাগবাজারের খাল। রাস্তার আরম্ভেই পাগলাগারদ, জেনারেল হাসপাতাল, হরিণবাড়ীর জেলখানা। আরও উত্তর মুখে খানিক দূর গেলে লামার্টিন কলেজ (অতি সুন্দর বাড়ী), বিশপ কলেজ। আরও উত্তরে কাম্বেল হাসপাতাল, শিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেশন। এই খানে নূতন হারিসন রোড।

কলিকাতা সহরের দক্ষিণাংশকেই চৌরঙ্গী বলা যাইতে পারে; এই অংশে ইংরাজদিগের বাস (এখন বাঙ্গালী ভদ্র লোকও এ অংশে বাস করেন), এ অঞ্চলের রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও সরল। নগরের উত্তরাংশে দেশীয় লোকের বাস, এ অংশের অধিকাংশ রাস্তা সংকীর্ণ ও বক্র। কলিকাতা সহরের প্রায় সকল অঞ্চলেই মধ্যে মধ্যে বসতি আছে। যেখানে গরিব লোকেরা খোলার ঘর বাঁধিয়া বহু লোক এক জায়গায় বাস করে, তাহাকে বস্তি বলে। বস্তি বড় জঘন্য। এই জন্য অনেকে বলে, কলিকাতা সহরের সম্মুখ দিকে বড় বড় অট্টালিকা, কিন্তু ভিতরের দিকে শূকরের কুড়িয়া ঘর।

বিগত কএক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা নগরের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ার, যেখানে পুষ্করিণী ভরাট করিয়া কলের জল ধরিয়া রাখা হইয়াছে, এখানে আগে ডোবা ডাবি ছিল। ক্রিক রো নামই তাহার প্রমাণ। ক্রিক মানে খাল। ১৬৮৬ সালে কালীঘাটের মন্দির ও কলিকাতার মধ্যস্থলে জঙ্গল, জলাভূমি ছিল, ও তাহাতে বন্য পশু ও চোর ডাকাইত থাকিত। সেই জঙ্গলের দিকে চৌরঙ্গী ও থিয়েটার রোড হইয়াছে। এক্ষণে যেখানে লাট পাদ্রির কের্থিড্রাল নামক বড় গির্জা আছে, সেই খানে ওয়ারেণ হেষ্টিং বাঘ শিকার করিতেন। এক্ষণে গড়ের মাঠ অতি রমণীয়, কিন্তু সে কালে বর্ষার তিন মাস জলে ডুবিয়া থাকিত। জলের কলের দ্বারা নগরের বড় উপকার হইয়াছে। মাটীর নীচে দিয়া ড্রেণ বা নর্দ্দমা হওয়াতে রাস্তা দিয়া চলিতে আর নাকে কাপড় দিতে হয় না। এক্ষণে হারিসন্ রোড, ও অন্যান্য নূতন রাস্তা ও বস্তিতে নর্দ্দমা হওয়াতে নগরের উপকার ও শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রতি বৎসরই নগরে উত্তম উত্তম অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে।

রাস্তা ঘাট।— কলিকাতার আশে পাশে ৫০ ক্রোশের মধ্যে পাথর পাওয়া যায় না, তথাপি নগরের অধিকাংশ রাস্তাই পাথরের খোয়া ও রাবিস দিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। কোন কোন রাস্তায় ইটের খোয়া দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক রাস্তার মধ্যস্থল দিয়া গাড়ি ঘোড়া চলে, দুই পাশ দিয়া মানুষ গমনাগমন করে।

বাহন ও যান।— কলিকাতা সহরের কোন কোন বড় রাস্তায় ট্রাম-গাড়ি চলে। তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ী বিস্তর; কিন্তু বড় নড়ে চড়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীর দুই ঘোড়ার ভাল গাড়িও বিস্তর আছে। এক্ষণে কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর ভাড়াটে গাড়ি হইয়াছে। সন্ধ্যার সময়ে গড়ের মাঠে খুব ভাল ভাল গাড়িঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

বাণিজ্য।— ভারতবর্ষে যত বাণিজ্য বিনিময় হইয়া থাকে, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ কলিকাতায় হয়। আমদানি জিনিসের মধ্যে বিলাতী সূতা ও কাপড়, লোহা ইত্যাদি ধাতু, কল কব্জা, লবণ, বিলাতী সুরা। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে অহিফেণ, পাট, চাউল, তৈল, নানা প্রকার শস্য, নীল, চামড়া, চা, রেশম, সোরা। বিদেশের সঙ্গে বৎসরে ৫৯ কোটি টাকার বাণিজ্য বিনিময় হয়।

শিক্ষা।—ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা বঙ্গ দেশে এবং কলিকাতা সহরে প্রথমে আরম্ভ হয়। অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কলেজে বহুসংখ্যক যুবক শিক্ষালাভ করে। স্বর্গীয় ডাক্তার ডফ ইংরাজী শিক্ষাবিষয়ে অনেক যত্ন করেন। গবর্ণমেণ্ট ও মিশনরী কলেজ ব্যতীত দেশীয় লোকদিগের স্থাপিত অনেক উৎকৃষ্ট কলেজ আছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার ফল আশানুরূপ হয় নাই। কলিকাতার সুযোগ্য নিবাসী ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একবার কলিকাতার এক সভায় বলিয়াছিলেন ;—

"এক শত বৎসর হইল, এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি প্রকৃত শিক্ষার প্রথম ফল অর্থাৎ বিদ্যালোচনা হয় নাই। আমার বলিতে ইচ্ছা করে যে, সামাজিক শাসনপ্রণালী হিন্দু-চরিত্রের অতি কমনীয় লক্ষণ ছিল, ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা তাহা বিনষ্ট হইয়াছে।···আপনারা দেখিয়া থাকিবেন, আমাদের সমাজে এক প্রকার পশ্চাৎগতি চলিতেছে; তাহাতে হিন্দুজাতির উন্নতির বিলক্ষণ বাধা জন্মাইতেছে; যে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা পৃথিবীর এই অংশের কলঙ্কস্বরূপ, লোকে পুনরায় সেই দিকে ধাইতেছে।—ঋষিদিগের অমার্জিত উক্তি এবং অসত্য ধারণা নিতান্ত সত্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। তোমাদের পরস্পর মতের অনৈক্য হইতে পারে, আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত তোমার মতের মিলন না হইতে পারে, কিন্তু ঋষিদিগের মত বেদবাক্য, ইহার প্রতিবাদ করিতে নাই। বাস্তবিক এই পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের কথা বিশ্বাস করিলে, ঋষিদিগের বাতুলতার অনুমোদন না করা আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষে অতি লাঞ্ছনার বিষয়।"

পরে দেখাইব যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশেও লোকের মনোভাব ন্যূনাধিক পরিমাণে বঙ্গ দেশের ন্যায়।

কলিকাতার একটী কুরীতি দেখিয়া দুঃখ হয়, এখানে বাঙ্গালি নাট্যশালায় বেশ্যারা অভিনয় করিয়া থাকে। নাট্যশালায় অনেক যুবক তাহাদের হাবভাব দেখিয়া অবশেষে কুপথগামী হয়। এক্ষণে কলিকাতার কলেজ ও স্কুলের আশপাশ হইতে বেশ্যাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভরসা করি, বাঙ্গালী যুবকেরা ক্রমে জ্ঞান শিক্ষা করিবেন, আর দেখিবেন যে, কেবল দেশীয় বলিয়া মিথ্যা ধর্ম্ম ও অনিষ্টকর দেশাচারের পক্ষপাতী হওয়া মিথ্যা দেশহিতৈষিতা মাত্র। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে যখন সহমরণ প্রথা তুলিয়া দেওয়া হয়, তখন কলিকাতার গোঁড়া হিন্দুরা সেই নৃশংস প্রথা রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখনও যে সকল কুপ্রথা আছে, তাহা উঠিয়া গেলে দেশের অনেক উপকার হইবে।

বঙ্গদেশের যুবকদিগের যে সকল গুণ আছে, তাহার পোষণ ও যে সকল ত্রুটি আছে, তাহার সংশোধনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যুবকদিগকে যত্ন সহকারে গৃহে শিক্ষা দেওয়া বড় আবশ্যক। বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও ধর্ম্ম-শিক্ষার সংযোগ অতি বাঞ্ছনীয়। বাঙ্গালি সংবাদপত্রের খেউড় গাওয়া রহিত হইলে অনেক উপকার হয়।

বাঙ্গালী-ধর্ম্ম-সংস্কারক।—বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে কএকটী অতি বিখ্যাত ধর্ম্ম-সংস্কারক জন্মিয়াছেন। রামমোহন রায় স্বদেশীয় লোকদিগকে প্রতিমাপূজায় বিরত করণার্থ যথাসাধ্য যত্ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তিনি যে কার্য্যের আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা অবাধে চলিতেছে। বাবু কেশবচন্দ্র সেন বহু বৎসর কাল সরল অদ্বৈতবাদের পক্ষ-সমর্থন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু শেষ কালে, চক্ষের ব্যাঘাত ও মানসিক শক্তির ব্যতিক্রম হওয়াতে, "প্রভু" ও "ভারতমাতার" নামে কথা কহিয়া, "নববিধান" নামে এক অভিনব ও মিশ্র ধর্ম্মমত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তদবধি তাঁহার স্থাপিত ধর্ম্ম-সমাজের আভ্যন্তরীণ বিচ্ছেদবশতঃ অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

১৮৭৯ সালে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হয়, ইহা কেশব সেনের সমাজ হইতে বহির্গত, ইহা অদ্বৈতবাদী। ইহার মুখপত্র "ইণ্ডিয়ান মেশেঞ্জার," উদ্দেশ্য ভাল।

সমাজভুক্ত লোকদিগের মতের অসামঞ্জস্য ও দলভেদনিবন্ধন অনেকে দুঃখ করে। সামান্য অদ্বৈতবাদ কোন জাতির বা কোন দেশের ধর্ম্ম হয় নাই। অতএব ব্রাহ্ম-সমাজের স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ আছে। তথাপি হিন্দু-ধর্ম্ম অপেক্ষা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অনেক গুণে ভাল।

আদি-গঙ্গার তীরে কালীঘাট স্থাপিত। কালীঘাটবিষয়ক কাহিনী এই।—একদা দক্ষ-যজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে, মহাদেব সেই মৃত-দেহ মস্তকে করিয়া পৃথিবীময় পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করেন; ইহা দেখিয়া বিষ্ণু সুদর্শনচক্র দ্বারা সতীর দেহ কাটিয়া ৫২ খণ্ড করেন। ভারতের যেখানে যেখানে সেই খণ্ড পড়িয়াছে, তাহাকে পিঠস্থান বলে। কালীঘাটে একটী অঙ্গুলি পড়িয়াছিল। ৩০০ শত বৎসর হইল, মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এক জন ব্রাহ্মণ মন্দিরে পূজার্চ্চনা করিবার ভার প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার বংশধরেরা এক্ষণে হালদার নামে বিখ্যাত। কালীঘাটের মন্দির ও মন্দিরসংক্রান্ত দেবত্র ভূমি এক্ষণে ইহাঁদিগেরই সম্পত্তি। দুর্গোৎসব বঙ্গদেশের প্রধান পর্ব্ব। অষ্টমীর দিন কালীঘাটে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। সেই দিন এত পাঁঠা বলি হয় যে, তাহার রক্ত নর্দ্দমা দিয়া চলিয়া যায়। কালী ঘোর কৃষ্ণবর্ণা, আকৃতি অতি বিকট, দেখিলে ভয় করে, জিহ্বাগ্র হইতে রক্ত

পড়িতেছে, গলায় মুণ্ডমালা, কটিদেশে নরজিহ্বার কটিবন্ধনী, পদতলে উলঙ্গ মহাদেব। একটী প্রবাদ আছে, যেমন দেবতা তেমনি ভক্ত। এমন ভয়ানক মূর্ত্তির ধারণা করিলে কি উপকার হইতে পারে?

বঙ্গদেশের মধ্যে কলিকাতা প্রধান নগর। এই দেশের বিবরণ সংক্ষেপে লিখিতেছি, বঙ্গদেশের পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহের বিবরণও লিখিত হইবে।

## নিম্ন-বঙ্গ।

আলিপুরের ছোট লাট সাহেবের অধীনে চারিটী প্রদেশ আছে।—বঙ্গ, বেহার, উড়িষ্যা, ও ছোট নাগপুর। ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড, ধনশালী, ও বহু জনাকীর্ণ। ইহার পরিধি ৮০০০০, বর্গ ক্রোশ অথবা দেশীয় রাজাদিগের অধীন রাজ্য লইয়া প্রায় ১০০০০০ বর্গ ক্রোশ, সমগ্র ভারতবর্ষের নয় ভাগের এক ভাগ। লোকসংখ্যা প্রায় সাত কোটি। প্রত্যেক প্রদেশের বিবরণ স্বতন্ত্র লিখিব।

## বঙ্গদেশ।

বঙ্গোপসাগরের উত্তর উপকূল হইতে হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত ভূমিখণ্ডকে বঙ্গদেশ বলা যায়। সমগ্র দেশই সমভূমিময়; প্রধান শস্য ধান্য। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বহুশাখা বিস্তার করিয়া এই দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। দেশের পরিধি প্রায় ৩৭৫০০ বর্গ ক্রোশ, ভারতবর্ষের কুড়ি ভাগের এক ভাগ।

বাঙ্গালিদিগের সংখ্যা প্রায় চারি কোটী। ভারতবর্ষের প্রতি ছয় জন লোকের মধ্যে এক জন বাঙ্গালী। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করে, ও প্রধান খাদ্য ভাত, এই জন্য বাঙ্গালিরা ভারতবর্ষের মধ্যে অতি দুর্ব্বল জাতি; কিন্তু ইহারা পরিশ্রমী এবং বিদ্যাবুদ্ধিবিষয়ে সর্ব্বপ্রধান। ভারতের সভ্য ও অসভ্য সকল জাতীয় লোকের মাথায় পাগড়ী বা টুপি আছে, কেবল বাঙ্গালির মাথা খালি।

বাঙ্গালা ভাষা আর্য্যভাষা-পরিবারভুক্ত। ইহাতে অনেক সংস্কৃত কথা কাছে। বাঙ্গালা অক্ষর দেবনাগরী অক্ষরের রূপান্তর, কিন্তু সহজে ও শীঘ্র লিখিতে পারা যায়; বাঙ্গালি মুসলমানেরা বাঙ্গালার সহিত অনেক আরবি কথার ব্যবহার করে, এই জন্য তাহাদের ভাষাকে মুসলমানী বাঙ্গালা বলে, এই ভাষায় অনেক গদ্য পদ্য পুস্তক আছে। বঙ্গদেশের প্রধান আরাধ্য দেবতা কালী বা দুর্গা, নদী মধ্যে গঙ্গার মান্য অধিক, কৃষ্ণের অবতার বলিয়া অনেকে চৈতন্যের উপাসনা করিয়া থাকে। দেশের অর্দ্ধেক লোক মুসলমান।

সে কালে স্বাধীন রাজারা বঙ্গদেশ শাসন করিতেন। সুবর্ণগ্রাম, নবদ্বীপ ও গৌড়, পরে পরে রাজধানী ছিল, ১২০৩ সালে মুসলমানেরা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজয় করতঃ গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করেন, সেই অবধি বঙ্গদেশ পরাধীন।
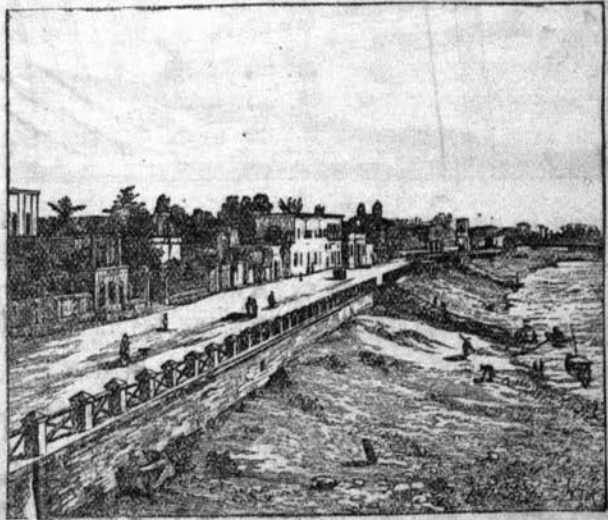
মুসলমানেরা শেষে ঢাকা ও মুরশীদাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭৬৫ সালে দিল্লীর বাদসা সাহ আলম নিম্ন-বঙ্গের রাজস্ব আদায়ের ভার ইংরাজদিগকে দান করেন। ১৮৫৩ সালে বঙ্গদেশ শাসনার্থ ছোট লাট নিযুক্ত হয়েন। তৎপূর্ব্বে বড় লাটের হাতে শাসন ভার ছিল।

কলিকাতা হইতে ১১ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গার পশ্চিম তীরে চন্দননগর নামে একটী নগর আছে। ইহা ফরাশি-দিগের। ১৬৭৩ সালে ফরাশিরা এই স্থান প্রথম বার অধিকার করে। ইংরাজেরা অনেক বার এই নগর দখল করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ধি হইলে পর পুনরায় ফিরাইয়া দেন।

## পূর্ব্ব বাঙ্গালা।

কলিকাতার পূর্ব্ব দিকে ঢাকা অঞ্চলে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর অনেক শাখাপ্রশাখা হইয়া প্রদেশটা নদীময় করিয়া ফেলিয়াছে। বর্ষাকালে দেশের অধিকাংশ স্থান জলে ডুবিয়া যায়। পুষ্করিণী কাটিয়া, বা খাল হইতে মাটী তুলিয়া জলা ভরাট করিয়া লোকে বসতি করিয়াছে। কোন কোন জিলায় লোকের চালে চালে ঘর; কোন কোন জিলায়, প্রতি গৃহস্থের বাটীর চারি দিকে নারিকেল, শুপারি, কলা, ইত্যাদির বাগান; যেমন বরিশাল ও যশোহর জিলায়। বর্ষাকালে কোন কোন জিলার লোকে শালতি নামে এক প্রকার ডোঙ্গা নৌকা ব্যবহার করে; যেমন ২৪ পরগণা, খুলনা ইত্যাদি জিলায়। কিন্তু ঢাকা, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট ইত্যাদি জিলায় মাঠে অনেক জল হয়, খাল এক টানা, নদীও বড় বড়, সেই জন্য ছোট বড় নৌকার ব্যবহার হয়। কলিকাতার দক্ষিণ সুন্দরবনেই শালতির ব্যবহার অধিক, কেননা এখানকার কোন কোন খাল দুই হাতের অধিক চৌড়া নহে। লোক-দের বাসগৃহ পর্ণকুটীর; তবে যাহারা সঙ্গতিপন্ন, তাহারা ইষ্টকনির্ম্মিত বাটীতে বাস করে। মাঠ জলে ডুবিয়া গেলেও জিলা বিশেষে রোয়া, বা বোনা ধান্য যথেষ্ট জন্মে।
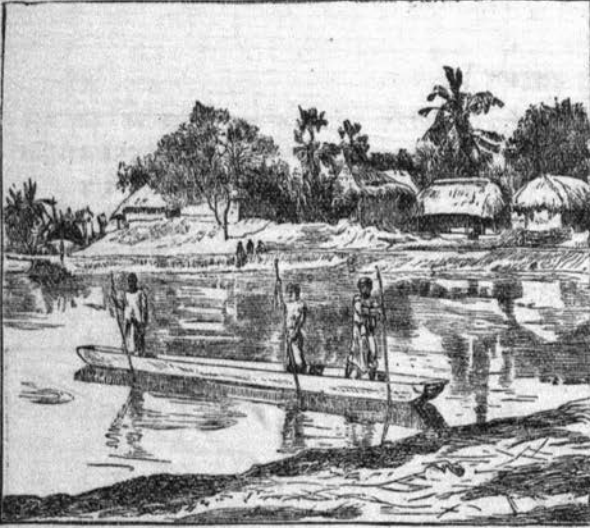
বর্ষাকালে নৌকা ভিন্ন গমনাগমনের আর কোন উপায় নাই। লোকেরা নৌকা করিয়া হাটে বাজারে ও বালকেরা পাঠশালায় যায়, আশ্বিন মাসে জল কমিতে আরম্ভ হইলে, সর্ব্বত্র নৌকা চলে না, গমনাগমনের বড় কষ্ট হয়; কিন্তু শীতকালে কোন কষ্ট থাকে না।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। কয়েকটী মাত্র বড় বড় নগর আছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালার প্রধান নগর ঢাকা, বুড়ী-গঙ্গা নামে যে নদী ব্রহ্মপুত্রে গিয়া পড়িয়াছে, ঢাকা নগর সেই নদীর তীরস্থিত। দ্বাদশ শতাব্দীতে ঢাকায় মুসলমানদের রাজধানী ছিল, তখন এখানে বহু লোক বাস করিত। ঢাকার মসলিন অতি বিখ্যাত, এই কাপড় এত মিহীন যে, লোকে আদর করিয়া ইহাকে বোনা বাতাস বা জলতরঙ্গ বলিত, এ কাপড় পরিধানযোগ্য নহে। এক সময়ে ঢাকা নগরের লোকসংখ্যা বড় কমিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে বৃদ্ধি হইতেছে। লোকসংখ্যা অনুসারে ঢাকা হাবড়ার পরে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের সমুদ্র ও নদীতীরবর্ত্তী লোকেরা ডাকাইতের অত্যাচারে বড় কষ্ট পাইত। মগেরা নৌকা করিয়া নদীপথে বহুদূর গিয়া গ্রাম জ্বালাইয়া দিত, নিবাসীদিগকে কাটিয়া ফেলিত কিম্বা দাস করিয়া লইয়া যাইত।

## আসাম।

পূর্ব্বে আসাম দেশ বাঙ্গালার ছোট লাটের অধীন ছিল, ১৮৭৪ সালে এই দেশ পৃথক ও প্রধান কমিশনরের অধীন হইয়াছে। শ্রীহট্ট ও কাছাড়ও আসামের সামিল।

আসাম দেশ অপ্রশস্ত উপত্যকা মাত্র, প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র। ইহা কামরূপের প্রাচীন হিন্দু-রাজ্যের অংশ মাত্র। প্রস্তরময় অট্টালিকা ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেশের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধর্ম্ম-ক্ষিপ্ত মুসলমানেরা পশ্চিম অঞ্চল হইতে যাইয়া আসামদেশ ছারখার করে। পরে কোচ নামে এক

জাতীয় ভয়ানক আদিমবাসী উত্তর দিগ হইতে আসিয়া আসাম জয় করে। কিছু কাল পরে পূর্ব্ব দিগ হইতে অসম নামে এক জাতীয় লোক আসিয়া কোচদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়। আবার ব্রহ্মদেশীয় মগেরা আসিয়া উৎ-পাত আরম্ভ করিলে, আসামীয়েরা ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করে। গত শতাব্দীতে আসামের অনেক স্থান লোকশূন্য হইয়া যাওয়াতে আসাম ও পূর্ব্ব বাঙ্গালার ৩০,০০০ বর্গ মাইল উর্ব্বরা ভূমি পতিত পড়িয়া থাকে। প্রথম যুদ্ধের পর ১৮২৪ সালে আসাম দেশ ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হয়। ২৫ বৎসর কাল বন্য পশু বধ করণার্থ পুরস্কার দানে ভূমির রাজস্ব অপেক্ষা অধিক ব্যয় হইত। আসামের পরিধি ৪৬,০০০ বর্গ মাইল—বঙ্গদেশের অর্দ্ধেকের কিছু বেশী, কিন্তু লোকসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ মাত্র। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য প্রধান। প্রথমে ভারতবর্ষের মধ্যে আসামদেশে চা-বাগান হয়। খাসিয়া পর্ব্বতে সীলং নামে একটী নগর হইয়াছে, এই সীলং আসামের রাজধানী; প্রধান কমিশনর এই খানে থাকেন। পূর্ব্বে চঁরাপুঞ্জি সদর ষ্টেশন ছিল। এখানে যেরূপ বৃষ্টিপাত হয়, পৃথিবীর আর কোন স্থানে তেমন হয় না। বৃষ্টির জল সরিয়া না গেলে ৪৩ ফুট গভীর একটা হ্রদ হইত।

বাঙ্গালা ভাষার সহিত আসামী ভাষার যেরূপ সাদৃশ্য, তাহাতে উহাকে বাঙ্গালা ভাষার রূপান্তর বলিলেও হয়।

আসামের দক্ষিণে নাগা, জয়ন্তী, খাসিয়া ও গারো পর্ব্বত—জঙ্গলময়। উক্ত পর্ব্বত সকলে নানা জাতীয় জঙ্গলী লোকের বাস, তাহাদের মুখাকৃতি অনেকটা চীন দেশীয় লোকদের ন্যায়। আসামের অন্তর্গত হইলেও শ্রীহট্টকে বঙ্গদেশের এক অংশ বলিতে হইবে। শ্রীহট্টের ভাষা বাংলা। শ্রীহট্টের পূর্ব্ব দিকে কাছাড়। এই উভয় জিলাতে এক্ষণে অনেক চা-বাগান হইয়াছে। চরাপুঞ্জীর কমলালেবু ও ছাতকের চুণ অতি বিখ্যাত।

## উড়িষ্যা।

বঙ্গ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সুবর্ণরেখা নদীর মুখ হইতে চিল্কা হ্রদ পর্য্যন্ত সমুদ্রের কূলবর্ত্তী ভূমিখণ্ডকে উড়িষ্যা প্রদেশ কহে। ইহার পরিধি ২৪০০০ বর্গ মাইল—বঙ্গদেশের তিন ভাগের এক ভাগ; কিন্তু লোকসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ। এই প্রদেশের মধ্যভাগ জঙ্গলময়, ছোট ছোট পর্ব্বতে পরিপূর্ণ, তাহাতে বন্য-পশুর বাস।

দেশের প্রকৃত নাম উদ্র দেশ, অর্থাৎ উদ্রজাতীয় লোকের দেশ। পুরাকালে ইহাকে উৎকল বলা যাইত। ১৭৫১ সালে এই দেশ মহারাষ্ট্রগণ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ১৮০৩ সালে ইংরাজেরা দখল করেন।

সমুদ্রের কূলবর্ত্তী অঞ্চলে যে লোকেরা বাস করে, তাহাদিগকে উড়িয়া বলে; তাহাদের ভাষা অনেকটা বাঙ্গালার ন্যায়। উড়িয়ারা লোহার কলম দিয়া তালপত্রে চিঠীপত্র লেখে। মহাজন ও জমীদারদের হিসাব এবং দাখিলা তাল পত্রে লিখিত হয়। উত্তর-ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহের মধ্যে কেবল উড়িয়া অক্ষরের মাত্রা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি।

এই প্রদেশ এখন অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। বেলুন উড়িলে কলিকাতায় যেমন, গরুর গাড়ী দেখিলে উড়িষ্যার অনেক পল্লীগ্রামের লোক তেমনি আশ্চর্য্যান্বিত হয়। অধিকাংশ লোক মূর্খ, পেটুক এবং কুসংস্কারাপন্ন; কিন্তু সুখের বিষয় এই, ক্রমেই তাহাদের উন্নতি হইতেছে। বহুসংখ্যক উড়িয়া কলিকাতায় ইংরাজ ও বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে মালি, বেহারা, ছুতার ও ভিস্তির কাজ করে, এতদ্ব্যতীত চটের কলে অনেক উড়িয়া চাকর আছে।

আদিমনিবাসী পাহাড়ীয়া লোকের ভাষা নানা প্রকার, তাহারা নিতান্ত অসভ্য। এক জাতি পাহাড়ী লোকের নাম খন্দ, যথেষ্ট শস্যের আশায় তাহারা পৃথিবীর নিকট নরবলি দিত। উড়িষ্যাদেশ চারিটী জেলায় বিভক্ত;—উত্তরে বালেশ্বর, মধ্যস্থলে কটক, সর্ব্বদক্ষিণে পুরী। দেশের দশ আনা অংশ পর্ব্বতময়, সে সকল ছোট ছোট করদ-রাজার অধীন। এই অংশকে পর্ব্বতময় জিলা বলে।

পুরীর অন্য নাম পুরুষোত্তম। এখানে জগন্নাথের এক প্রস্তরময় মন্দির আছে। আজিও জগন্নাথের নাম শুনিয়া ভারতবর্ষের শত শত প্রদেশ হইতে ভক্ত হিন্দুগণ বহুকষ্ট ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া থাকে।

তীর্থস্থানে গিয়া দেবতা দর্শনের অনিবার্য্য আকাঙ্ক্ষা হিন্দুজাতির জাতীয় চরিত্রের এক প্রধান লক্ষণ। সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া দলে দলে যাত্রি পুরীতে উপস্থিত হয়। উড়িষ্যার পথ ৩০০ মাইল দীর্ঘ, পথের পার্শ্ববর্ত্তী প্রত্যেক গ্রামে যাত্রিদিগের থাকিবার জন্য চটী আছে। এক এক দলে কুড়ি হইতে ৩০০ শত যাত্রি থাকে।

যে বৎসর বিশেষ উৎসব হয়, সে বৎসর কটকে এত যাত্রি যায় যে, তাহারা রাস্তায় জাঙ্গাল বাঁধিয়া চলে। এক এক দলে এক এক জন দলপতি থাকে, সকলে সেই দলপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ হইতে দশ ভাগের নয় ভাগ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক। ঐ দেখ, শাদা ধুতি পরা অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট কতকগুলি

স্ত্রীলোক তালপত্রের ছাতি ধরা দণ্ডাকৃতি এক ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, ইহারা বঙ্গদেশের যাত্রি। ঐ দেখ, নাকে নৎ, মুখে ও কপালে উল্কি ও অত্যন্ত মলীন লাল কাপড় পরা এক দল সবলকায় স্ত্রীলোক আর এক জন উড়িয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে, উহারা উত্তর ভারতবর্ষের হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক।

শতকরা ৯৫ জন যাত্রি পদব্রজে যায়। এই যাত্রিদের সঙ্গে নানা দেশীয় ও নানা মতাবলম্বী সন্ন্যাসী গমন করিয়া থাকে;— কাহারও সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখা, কেহ বা প্রায় উলঙ্গ, কাহার মাথায় জটাজূট, কাহার গলায় রুদ্রাক্ষের, কাহার গলায় তুলসির মালা, সকলেরই কপালে রক্ত বা শ্বেত চন্দনের ফোঁটা এবং সকলেরই হাতে যষ্টি।

মধ্যে মধ্যে কেঁকর কেঁকর শব্দ করিতে করিতে, ঢাকাঢোকা গরুর গাড়ী রাস্তা দিয়া যায়। যে গুলি ছোট ছোট বলদে টানে, সেগুলি মথুরা অঞ্চলের। যেগুলি মথুরা অঞ্চলের, সেগুলি সাবধানে ঢাকা; দেখিলেই মুসলমান রাজত্ব কালের কথা মনে পড়ে। কিন্তু বাঙ্গালীরা গাড়ী ঢাকা কাপড়ে বড় বড় ছিদ্র করিয়া দেয়, সেই ছিদ্র দিয়া বাঙ্গালি স্থন্দরীরা এ দিক ও দিক দেখিতে দেখিতে প্রফুল্ল মনে পুরুষোত্তমাভিমুখে যায়। ঐ দেখ, দিল্লী অঞ্চলের এক মহিলা রঙ্গবিরঙ্গের পাজামা পরিয়া এক্কায় চড়িয়া যাইতেছেন, তাঁহার স্বামী ঘোড়া ধরিয়া এক পাশে সহিসের মত চলিয়াছেন, সঙ্গে এক জন দাসী, তাহার হাতে একটী গঙ্গা জলের ঘটী, আর খানকতক কাপড়। ইহাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ দেখ, কলিকাতার কোন ধনবান ব্যক্তি সপরিবারে জগন্নাথ-দর্শনে চলিয়াছেন। আমি এক বার এক দলে চল্লিশখানা পাল্কি, ৩২০ জন বাহক ও পঞ্চাশ জন ভারী দেখিয়াছিলাম। পাল্‌কি বেহারারা যে শব্দ করিতে করিতে দ্রুত পদে চলে, রাত্রিকালে সেই শব্দ অনেক দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ দেখ, উত্তর অঞ্চলের এক রাজা যাইতেছেন, সঙ্গে এক দল হাতী, উষ্ট্র ও সিপাহী। রাজা যেন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া থাংজাঙ্গে বসিয়া আছেন, লোকারণ্যের মধ্যে ভয়ানক গোলমাল ও চীৎকার, সকলেই অপরিষ্কার। বড় মানুষের বেলা এইরূপ হইয়া থাকে।
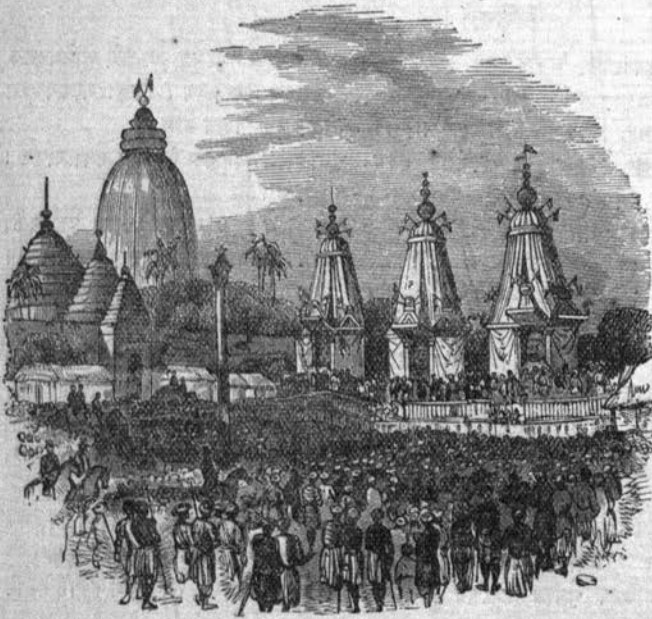
পীড়া ও মৃত্যুতে যাত্রিদিগের সর্ব্বনাশ হয়। যে কয় দিন পুরীতে থাকিতে হয়, সেই কয় দিন বাসস্থান ও আহারের বড়ই কষ্ট হইয়া থাকে। পাণ্ডারা বলে, পুরীতে রাঁধিয়া খাইতে নাই; স্থতরাং মন্দিরের পাচকেরা লক্ষ লক্ষ যাত্রির জন্য ভোগ রান্ধিয়া থাকেন। মন্দিরে যে খাদ্য সামগ্রী দত্ত হয়, তন্মধ্যে ভাতই প্রধান। মটর ও মাষকলাই, ঘৃত, চিনি ও চাউল দ্বারা নানা প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। মূল্য বড় বেশী নয়, এক আনা পয়সা দিলে দুই জনের মত ভাত পাওয়া যায়, কিন্তু পর্ব্ব সময়ে অনেক যাত্রি উপস্থিত হওয়াতে পাণ্ডারা ভাতের দাম চড়ায়। লোকদিগের নিকট বিক্রয় করিবার পূর্ব্বে ভাতগুলি জগন্নাথকে উৎসর্গ করিতে হয়, তাহা হইলেই তাহা জগন্নাথের মহাপ্রসাদ হইয়া যায় এবং যাত্রিরা ভক্তি করিয়া খায়। গরম গরম মহাপ্রসাদ অপুষ্টিকর নহে, তবে অনেক সময়ে পাক ভাল হয় না বলিয়া যাত্রিরা দুঃখ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সকলের ভাগ্যে গরম গরম জোটে না। মহাপ্রসাদ ফেলিয়া দিতে নাই, স্থতরাং এমন পচা ভাতও বিক্রয় হয় যে, তাহা খাইলে সুস্থ মানুষেরও অসুখ করিয়া থাকে, আর যাহারা পথের কষ্ট হেতু পেটের পীড়া লইয়া পুরীতে উপস্থিত
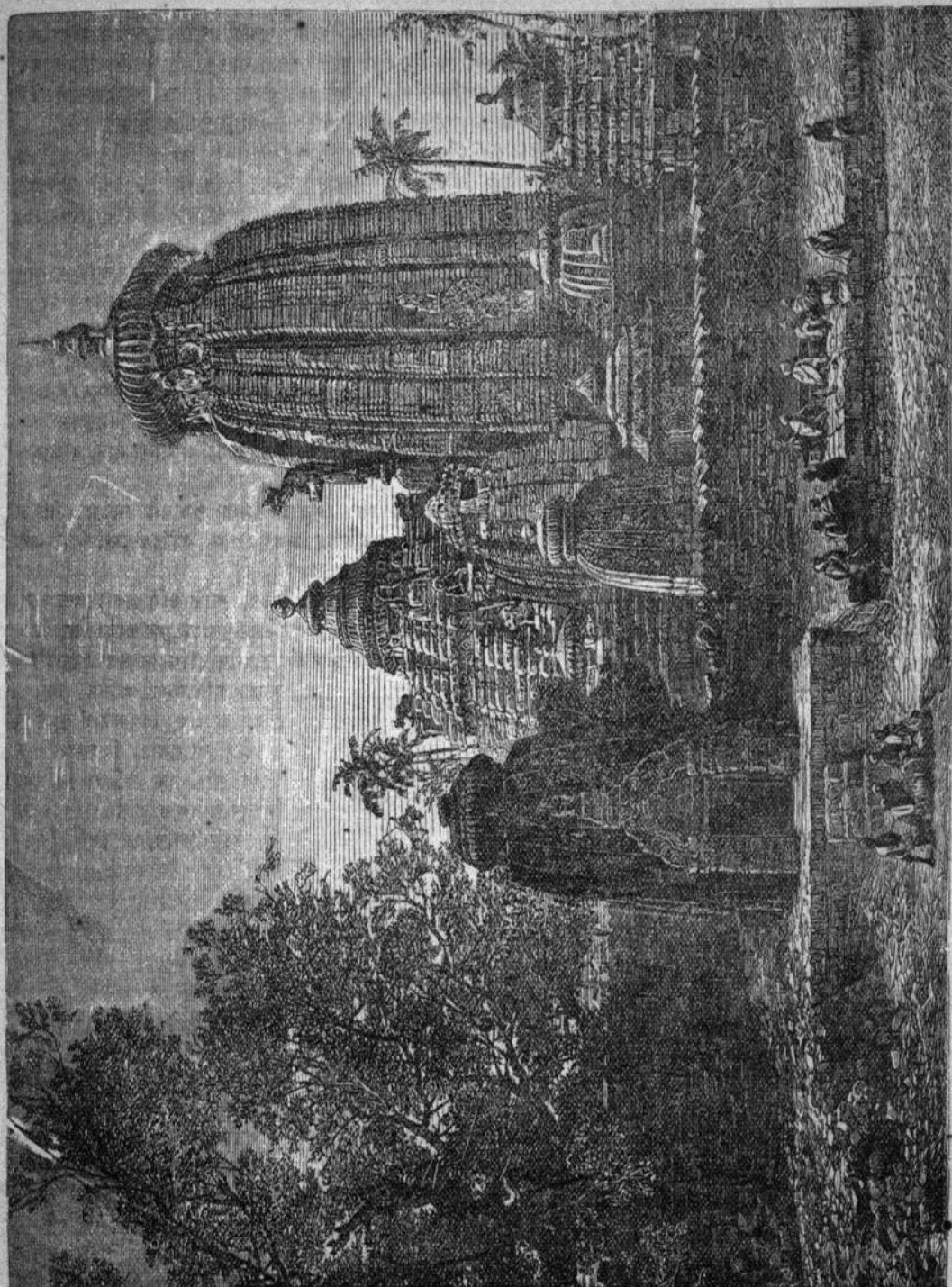
হয়, তাহাদের পক্ষে পচা মহাপ্রসাদ বিষ বিশেষ। ভারতবর্ষের এক জন বড় ডাক্তার বলেন, "শীত কালে ২৪

ঘন্টার পর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ভাত ও চাউল মিশ্রিত সমস্ত খাদ্য সামগ্রী পচিতে আরম্ভ হইয়াছে; ৪৮ ঘণ্টা পরে দেখি, সেগুলি পচিয়া এমন জঘন্য হইয়াছে যে, আর মুখে দেওয়া যায় না।" ইহাই যাত্রিদিগের প্রধান, আর উৎসব কালে যে শত সহস্র কাঙ্গালী উপস্থিত হয়, তাহাদের একমাত্র খাদ্য। মহাপ্রসাদ যতই পচুক না কেন, ফেলিয়া দিতে নাই; সুতরাং কেহ না কেহ খাইয়া থাকে। এখানে জাতির বিচার নাই।

পুরীতে এক প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, ইহা দুই দিন পর্য্যন্ত রাখিলেও পচিতে আরম্ভ করে না; কিন্তু যাত্রিরা এই মিষ্টান্ন দেশে লইয়া যায়, সুতরাং গৃহে পৌছিতে পৌছিতে পচিয়া দুর্গন্ধ হয়। ডাক্তার মাউয়েট বলেন, "ইহাতে মরা মাছি, পচা ঘি, এবং অপরিষ্কার চিনি থাকে; যদিও ইহা অপেক্ষা ভাল মিষ্টান্ন দেখিয়াছি, তথাপি স্বীকার করি, ইহা খাইলে উদরের পীড়া নিশ্চয় হয়।"

মন্দ খাদ্য সামগ্রী ভিন্ন যাত্রিদিগের পীড়া হইবার আরও অনেক কারণ আছে। পুরী বড় নীচু স্থান, বালির পাহাড় থাকাতে নগরের আবর্জ্জনা সমুদ্রে গিয়া পড়িতে পায় না, এই জন্য নগরটী অতি অপরিষ্কার। ঘরের মেঝে কাঁচা, বড় জোর দুই হাত উচ্চ। উঠানের মধ্যস্থলে এক নর্দ্দমা থাকে, তাহা দিয়া বাড়ীর আবর্জ্জনা ও জল রাস্তায় গিয়া পড়ে। নানা প্রকার ময়লা জমিয়া উঠান অত্যন্ত অপরিষ্কার হইয়া থাকে। আবার কোন কোন বাড়ীতে উঠানের এক পাশে গর্ত্ত আছে, বাড়ীর লোকেরা এই নরককুণ্ডের আশে পাশে বসিয়া আহার করে ও নিদ্রা যায়। বৎসরের মধ্যে সাত মাস এই গর্ত্ত হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ নির্গত হয়। দিবারাত্র এই গর্ত্তে যে গ্যাস জন্মে, তাহা বাহির হইবার পথ নাই। একে ঘরে তিন চারিটী কুঠরী, জানালা নাই, বাতাসও খেলে না।

উত্তম পানীয় জলের অভাবে যাত্রিদিগকে বড় কষ্ট পাইতে হয়। পুরীর সমস্ত পুষ্করিণী অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া গণ্য, কিন্তু অত্যন্ত অপরিষ্কার। যাত্রিদিগকে এই সকল পুষ্করিণীর জলই পান করিতে হয়, অথচ এই জলেই যাত্রিরা শৌচকর্ম্ম করিয়া থাকে।

জগন্নাথের উৎপত্তি বিবরণ এই।—ব্যাধের বাণে কৃষ্ণের মৃত্যু হইলে, তাঁহার অস্থি গুলি এক বৃক্ষের তলে পড়িয়া থাকে। কোন এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহা দেখিতে পাইয়া সংগ্রহ করত একটা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন, একটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া কৃষ্ণের অস্থি সকল তাহাতে রাখিবার জন্য উক্ত রাজা মনস্থ করিলেন। প্রতিমা নির্ম্মাণের জন্য রাজা বিশ্বকর্ম্মার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা এক গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। ১৫ দিবস পরে রাজা ভাবিলেন দেখি, বিশ্বকর্ম্মা কি করিতেছেন। রাজা দেখিতে পাইলেন, হস্ত পদশূন্য এক কদাকার প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়াছে। এক্ষণে মন্দির মধ্যে কৃষ্ণ, বলরাম ও তাহার ভগিনী সুভদ্রার মূর্ত্তি আছে। মন্দিরময় পাথরে খোদিত নানা জঘন্য আকৃতি, দেখিলে চক্ষে কাপড় দিতে হয়।

পুরীর আর এক নাম স্বর্গ-দ্বার, পাণ্ডারা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যাইয়া জগন্নাথের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করত যাত্রিদিগকে ভুলাইয়া আনে। পুরী-নগরের সর্ব্বত্র সোনা ছড়ান ছিল, কিন্তু কলিকালের পাপ বশতঃ স্বর্ণরেণু সকল ধূলা হইয়া গিয়াছে। যাত্রিদের অধিকাংশ স্ত্রীলোক,

ইহাদের অনেকে অভিভাবকের অনুমতি না লইয়া, পলাইয়া পাণ্ডার সঙ্গে যায়। অনেকের পথেই মৃত্যু হয়। রাস্তার দুই পার্শ্বে মানুষের হাড় পড়িয়া আছে।

কয়েক শত বৎসরকাল পুরী বৌদ্ধদিগের তীর্থ স্থান ছিল। শাক্যসিংহের একটা দাঁত এখানে থাকাতে লোকে তাহারই পূজা করিতে যাইত। সে দাঁত পরে সিংহলে নীত ও কান্দি নগরে এক মন্দিরের মধ্যে রক্ষিত হয়, শেষে পর্তুগিজেরা সেটা নষ্ট করে।

পুরী হইতে ১০ ক্রোশ দূরে কমরক নামে একটা ভাঙ্গা মন্দির আছে। ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি ইহার নির্ম্মাণ করিয়া সূর্য্যদেবকে উৎসর্গ করেন। মন্দিরের দেওয়ালে অতি কদর্য্য মূর্ত্তি খোদিত আছে। সমুদ্র হইতে এই মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে নাবিকদের অনেক সাহায্য হয়।

## দারজিলিং।

দারজিলিং কলিকাতাবাসিদিগের নিকটতর পর্ব্বত-আবাস। বাঙ্গলার ছোট লাট গ্রীষ্ম কাল এই খানে যাপন করেন। এখন কলিকাতা হইতে দারজিলিং পর্য্যন্ত রেল-পথ হইয়াছে, দূরত্ব ৩৬৪ মাইল।

দারজিলিং যাইতে হইলে, এক স্থানে জাহাজে করিয়া পদ্মা পার হইতে হয়। পুনরায় রেলে চড়িয়া সিলিগুড়ি নামক স্থানে নামিতে হয়। হিমালয় পাহাড়তলিকে তেরাই বলে, ইহা জঙ্গলময় ও খাল বিলে পরিপূর্ণ। এখানে বাস করিলে জর হয়। লেডি কেনিং এক রাত্রি তেরাইয়ে বাস করিয়া জরগ্রস্ত হন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এক্ষণে রেল-গাড়ীতে অতি শীঘ্র তেরাই পার হওয়া যায়। দারজিলিং পাহাড়ে উঠা বড় কঠিন, এই জন্য পাহাড়ের গোড়া হইতে অপ্রশস্ত রেল-পথ হইয়াছে।

১৮৩৫ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক সিকিমের রাজার নিকট দারজিলিং ক্রয় করেন, পরে আর অনেক পর্ব্বত ইহাতে যুক্ত হইয়াছে। বাসীন্দারা অধিকাংশই আদিমনিবাসী, নিম্ন ভূমি হইতে অনেক হিন্দু ও মুসলমান কার্য্য উপলক্ষ্যে গিয়া বাস করিয়াছে। পাহাড়ীদিগের আকৃতি চীনদেশীয় লোকের ন্যায়।

দারজিলিং জেলার নিম্ন ভূমিতে ধান্য জন্মে, পাহাড়ে গম, ভুট্টা, আলু ইত্যাদি বিলক্ষণ হয়। ইউরোপীয়দের তত্ত্বাবধানে অনেক চা-বাগান আছে। ১৮৫৬ সালে প্রথম চা-বাগান আরব্ধ হয়। ১৮৭৫ সালে ১২১ টী চা-বাগান ছিল, তাহাতে ২৪০০০ জন কুলী কাজ করিত, ইহাদের অধিকাংশ নেপালী। ১৮৬২ সালে গবর্ণমেণ্ট সিংকোনার চাষ আরম্ভ করেন। সিংকোনার বাকল হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয়, ইহা জরের প্রধান ঔষধ; এক্ষণে সিংকোনার যথেষ্ট চাষ হইতেছে।

ছবিতে কাঞ্চনজঙ্ঘা নামক হিমালয়ের একটী সর্ব্ব উচ্চ চূড়া দৃষ্ট হইতেছে। উহার পশ্চাৎ দিকে চিরতুষার, দিবাভাগে ঝকমক করে, মধ্যস্থলে অনেক পর্ব্বত ও উপত্যকা আছে।

## নেপাল।

এই বৃহৎ স্বাধীন রাজ্য দারজিলিংএর পশ্চিম দিকে। ইহার উত্তর সীমানা তিব্বৎ; দক্ষিণ সীমানা বৃটিশ-রাজ্য। এই রাজ্য দৈর্ঘ্যে ৪৬০ মাইল, এবং প্রস্থে ১৫০ মাইল। ইহার পরিধি ৫৪০০০ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ২০ লক্ষ।

দেশটী পর্ব্বতময়, পৃথিবীতে যে সকল পর্ব্বত সর্ব্ব উচ্চ বলিয়া বিদিত, তাহা এই দেশে। উত্তর সীমানা ক্রমে উচ্চ হইয়া চিরনিহার পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। নিম্ন স্থানের উপত্যকাগুলি বঙ্গদেশের সমভূমি হইতে ৩০০০ হাজার হইতে ৬০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ।

নিবাসীরা তাতার ও চীন জাতীয় নানা শাখাভুক্ত, আকৃতি, ধর্ম্ম, বা আচার ব্যবহারসম্বন্ধে হিন্দুদিগের সহিত কোন সাদৃশ্য নাই। গুরখা জাতীয় লোকেরাই দেশটী শাসন করে। তাহারা খর্ব্ব, কিন্তু বড় সাহসী যোদ্ধা। ভারতবর্ষীয় সৈন্যদলে অনেক গুরখা সিপাই আছে। ইহারা হিন্দু।

নেপালের রাজধানী কাটামুণ্ড, সমুদ্র হইতে চারি হাজার ফুট উচ্চ, রাজধানীর নিবাসী সংখ্যা ৫০,০০০। নগরের মধ্যস্থলে মহারাজার বাটী। রাজবাটীর কতক অংশ বড় পুরাতন, দেখিতে বর্ম্মা পাগডার মতন, নানা প্রকার কারুকার্য্যে পরিপূর্ণ। অনেক সুন্দর মন্দির আছে। অধিকাংশ মন্দির কাষ্ঠনির্ম্মিত, কারুকার্য্য, চিত্র ও গিল্‌টীর দ্বারা যার পর নাই সজ্জিত। অনেক মন্দিরের ছাত সমস্তই পিতল বা তামার দ্বারা গিল্‌টী করা, প্রত্যেক তলার কার্ণিসে বহুসংখ্যক ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা থাকে, বাতাসে সেগুলি টুং টাং করিয়া বাজে। গোম্বুজ ও স্তম্ভ যুক্ত প্রস্তরময় মন্দিরও আছে। কাটামুণ্ড নগরের রাস্তাঘাট বড় অপ্রশস্ত এবং সমস্ত নগরটী বড় অপরিষ্কার।
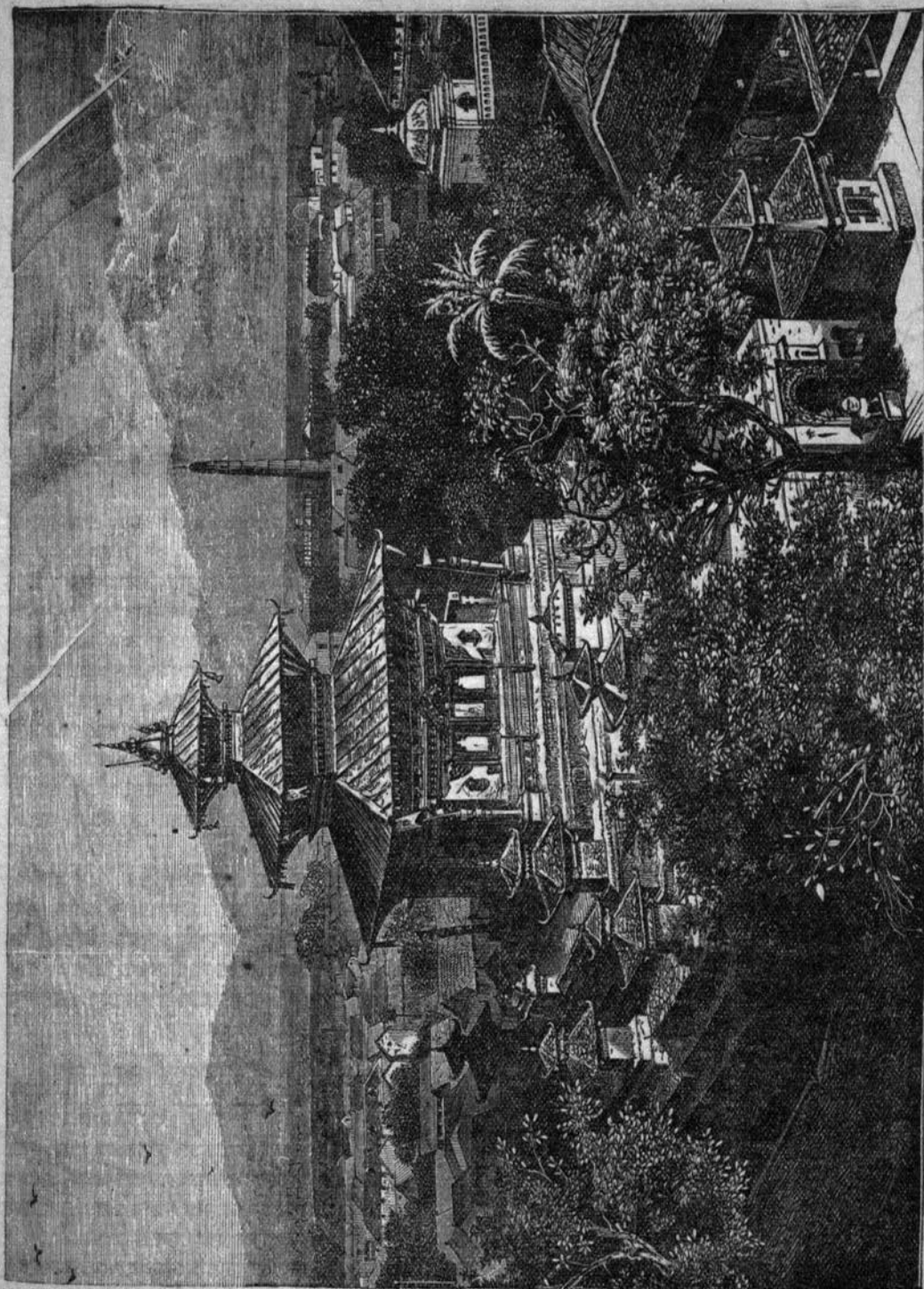
রাজবাটী হইতে ২০০ গজ দূরে একটী বড় বাটী আছে, তাহাকে কট বলে। ১৮৪৬ সালে এই বাটীতে দেশের অনেক প্রধান লোক হত হইয়াছিল। লোকেরা রাজ-মন্ত্রীকে বধ করাতে মহারাণী প্রতিশোধ লইতে চাহেন। তখন সৈন্যাধ্যক্ষ জঙ্গ বাহাদুর এই কার্য্যের ভার লয়েন। দেশের প্রধান ও মান্য গণ্য লোকদিগকে রাজবাটীতে একত্রিত করিয়া জঙ্গ বাহাদুর এক দল সৈন্যসহ প্রবেশ করত সকলকে বধ করেন। জঙ্গ বাহাদুর তৎক্ষণাৎ প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হয়েন, এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত দেশ শাসন করেন। কিছু দিন পূর্ব্বে আর এক হত্যা-কাণ্ডও হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মই নেপালের ধর্ম্ম। দেশময় কেবল মন্দির। যাজকদিগকে লামা বলে। "ওঁ মণিপদ্মেহম্" এই কথা কটী বার বার উচ্চারণ করিলে, বড় পুণ্য লাভ হয়। বিনা কষ্টে পুণ্য লাভ করিবার জন্য এই দেশের লোকে অনেক ফিকির জানে। অনেকে মনে করে, ঐ কথাকটী লিখিয়া বার বার উল্টাইলে বড় পুণ্য হয়। অনেকে জপের চাকা রাখে, হাত দিয়া বা দড়ী ধরিয়া সেই চাকা ঘুরাইলে পুণ্য লাভ হয়। অনেকে জলস্রোতের মধ্যে ঐ চাকা রাখিয়া দেয়, স্রোতের বেগে চাকা আপনি ঘুরিতে থাকে। অনেকে উক্ত চারিটী কথা পতাকায় লিখিয়া দেয়। বাতাসে যত বার পতাকা নড়ে, তত বার জপ হইল বলিয়া মনে করে। আবার জপের কল আছে, তাহাও বাতাসে চলে।

অন্তঃকরণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিই যথার্থ প্রার্থনা, আর সকলই বৃথা। আবার জীবনময় সত্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা উচিত। যে প্রতিমার কাণ আছে, অথচ শুনিতে পায় না, তাহার কাছে প্রার্থনা করিলে কোন ফল নাই! বরং পাপ হয়।

## কলিকাতা হইতে গঙ্গা দিয়া উত্তর মুখে গমন।

রেল-পথ হওয়াতে কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে যাওয়ার বড় সুবিধা হইয়াছে; কিন্তু প্রধান প্রধান স্থান গঙ্গার তীরবর্ত্তী বলিয়া নদী-পথ অবলম্বন করা গেল।

পূর্ব্বে জল-পথে গমনাগমনের নৌকাই প্রধান উপায় ছিল। নানা গড়নের ছোট বড় নৌকার ব্যবহার হইত। ধনী লোকের ব্যবহার জন্য যে নৌকা ছিল, তাহাতে উত্তম উত্তম কুঠরী থাকিত। এই সকল নৌকা কখন গুনে,

কখন পাইলে চলিত। কলিকাতা হইতে গঙ্গা উজাইয়া যাইতে হইলে, ডাইন তীরে বারাকপুর—এখানে অনেক সেনা থাকে ও বড় লাটের বাগান-বাটী আছে। বাম তীরে শ্রীরামপুর, এখানে পূর্ব্বে ওলোন্দাজদিগের উপনিবেশ ছিল। এই স্থানে প্রাতঃস্মরণীয়, কেরী, ওয়ার্ড ও মার্শমান সাহেব সুসমাচার প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আরও উজানে ফরাশীদিগের উপনিবেশ চন্দননগর। তার পরেই হুগলী। ইংরাজেরা সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গ-দেশে এই স্থান অধিকার করেন। ১৬৪০ সালে ডাক্তার ব্রাউটন্‌ দিল্লীর সম্রাটের একটী কন্যার ভয়ানক পীড়া আরোগ্য করাতে হুগলী নগরে কুঠী নির্ম্মাণের অনুমতি পান।

পদ্মানদী হইতে ভাগীরথী ও জলঙ্গী নামে দুইটী ছোট নদী বাহির হইয়া নদীয়ায় আসিয়া যেখানে একত্র হইয়াছে, সেই খানে হুগলী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। নদীয়ার সংস্কৃত টোল বিখ্যাত ; কিন্তু এক্ষণে লোকে আগ্রহসহকারে ইংরাজী শিখে, ইংরাজী না জানিলে বিষয়-কর্ম্মের সুবিধা নাই। পলাশির যুদ্ধ নদীয়ার নিকটে হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে সেই যুদ্ধ-ক্ষেত্রের উপর দিয়া ভাগীরথী বহিতেছে।

ভাগীরথীর গতির সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হয়, এবং চড়া পড়াতে নৌকা যাতায়াতের বাধা জন্মে।

নদীয়ার উত্তর দিকে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে মুরশিদাবাদ নগর। ১৭০৪ সালে মুরশিদকুলি খাঁ এই স্থানে বঙ্গের রাজধানী স্থাপন করত নিজ নাম অনুসারে নগরের নাম রাখেন। আজি পর্য্যন্ত নবাবের বংশধরেরা এই নগরে বাস করেন। নবাবের কএকটী চমৎকার অট্টালিকা আছে।

মুরশিদাবাদ জেলা ছাড়াইলে, বেহার বিভাগের আরম্ভ হয়।

বেহার বিভাগ অতি প্রকাণ্ড ও উর্ব্বরা, গঙ্গানদীর দ্বারা প্রায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত। কিন্তু ইহা বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক অপেক্ষাও কম, অথচ নিবাসী সংখ্যা অর্দ্ধেক অপেক্ষাও বেশী। বেহারে প্রতি বর্গ মাইলে ৫২০ জন লোকের বাস। ভারতবর্ষের আর কোন অংশে এত ঘন-বসতি নাই।

দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ ব্যতীত দেশটী সমস্ত সমতল। জল বায়ু উত্তম। অনেক পরিমাণে সোরা প্রস্তুত হয়। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান, গম ও জব প্রধান। অহিফেণও বিস্তর জন্মে। হিন্দি এবং উর্দ্দু প্রধান ভাষা, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশের পাহাড়ীরা সাঁওতালি ইত্যাদি অন্যান্য ভাষা বলে। জল-বায়ু ও খাদ্য-সামগ্রী উত্তম বলিয়া এই অঞ্চলের লোক বাঙ্গালী অপেক্ষা দীর্ঘকায় ও বলবান।

বৌদ্ধ উদাসীনদিগের বাসের জন্য যে সকল গৃহ ছিল, সে সকলকে বিহার বলিত, তদনুসারে এই প্রদেশের নাম বিহার হইয়াছে। পূর্ব্বকালের মগধ রাজ্য এই প্রদেশের অন্তর্গত, এখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলক্ষণ আলোচনা হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই প্রদেশ মুসলমানদিগের হস্তগত, ও বাঙ্গালার নবাবের অধীন তিন সুবার এক সুবা বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই প্রদেশ দখল করিয়া বাঙ্গালার সামিল করেন। ভাগীরথী উজাইয়া গঙ্গার মূল স্রোতে পড়িতে হয়, ইহার নাম পদ্মা। দক্ষিণ দিকে মালদহ। এই জিলায় এক মরা নদীর তীরে বঙ্গের এক সময়ে বিখ্যাত রাজধানী গৌড় নগরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। ১২০৪ সালে মুসলমানেরা এই নগর হস্তগত করিয়া ৩০০ শত বৎসর কাল এই খানে বাস করত বঙ্গদেশ শাসন করে। এই কালের মধ্যে মুসলমানদের অনেক মসজিদ ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। অতি অস্বাস্থ্যকর হওয়াতে ষোড়শ শতাব্দীতে এই নগর পরিত্যক্ত হয়। এখন গৌড় নগর জঙ্গলময়।

ইহার একটু উজানেই রাজমহলের পাহাড়, এই খানে গঙ্গা পূর্ব্ব দিকে না গিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ববাহিনী হইয়াছে রাজমহলের পাহাড় বড় উচ্চ নহে, সর্ব্বোচ্চ চূড়া ২,০০০ ফুট।

রাজমহলের বাড়ীগুলি প্রায় মাটীর কুটীর, মধ্যে মধ্যে দুই এক খানি ভাল বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটেই মুসলমান নগরের ভগ্নাবশেষ, কিন্তু জঙ্গলময়। আকবরের রাজপুত সেনাপতি মানসিংহ এই স্থানে বঙ্গের রাজধানী স্থাপন করেন। ত্রিশ বৎসর হইল, গঙ্গার গতি ফিরিয়া যাওয়াতে এক্ষণে রাজমহল হইতে গঙ্গা দেড় ক্রোশ পথ দূরে।

রাজমহল হইতে কুড়ি ক্রোশ উজানে কোলগাঁ পাহাড়, এই পাহাড়ে গঙ্গার গমন-পথে বাধা জন্মিয়াছে। প্রধান পাহাড়ের নাম দেবীনাথ, ইহার চূড়ায় একটী হিন্দু-মন্দির আছে। পাহাড়ের গায়ে অনেক দেবমূর্ত্তি খোদিত। কোলগাঁ ছাড়াইয়া গেলে জিলার সদর মহকুমা ভাগলপুর। এই প্রদেশের দক্ষিণ অংশে সাঁওতাল নামে আদিম জাতীয় লোকের বাস, ইহাদিগকে সন্তালও বলে। তাহাদের বিবরণ লিখিতেছি;—

## সন্তাল।

গঙ্গা হইতে বৈতরণী নদী পর্য্যন্ত ৮২ ক্রোশ দীর্ঘ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রদেশে সন্তালদিগের বাস। পশ্চিম দিকের জঙ্গলে কেবল সন্তালেরা বাস করে, কিন্তু নিম্ন-ভূমির হিন্দুদিগের সহিত তাহারা সচরাচর মিশিয়া থাকে। তাহাদের সংখ্যা ১১ লক্ষ।

হিন্দু অপেক্ষা সন্তাল খর্ব্বকায়, কপাল তত উচ্চ নয়, কিন্তু গোলাকার ও প্রশস্ত; আর্য্যগণের অপেক্ষা ওষ্ঠ একটু পুরু, কিন্তু বড় বেশী পুরু নহে যে, চক্ষে পড়িবে। কলারীয় নামে এক শ্রেণীর ভাষা আছে, সন্তালদিগের ভাষা সেই শ্রেণীভুক্ত; ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চলের কোন ভাষার সহিত সন্তালি ভাষার সংস্রব নাই। লিখিত ভাষা না হইলেও ইহার বৈয়াকরণিক গঠন অতি নির্দ্দোষ। নাগরী ও রোমীয় অক্ষরে এই ভাষা এক্ষণে লিখিত হইতেছে।

সৎকার্য্যের পুরস্কারদাতা কোন দেবতা সন্তালদের নাই; কিন্তু তাহারা অনেক ভূত মানে, পূজা ও বলিদান না করিলে, সেই ভূতেরা মনুষ্য ও পশুদের নানা প্রকার পীড়া ও শস্যে পোকা জন্মায়।

ক্লেবলণ্ড নামে এক জন সিভিল কর্ম্মচারী অতি প্রথমে সন্তালদিগকে সভ্য করিতে চেষ্টা করেন। গত শতাব্দীতে নিম্নভূমি নিবাসী হিন্দুদিগের সহিত সন্তালগণের অনেক বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া গিয়াছে। বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে হিন্দুরা সন্তাল-দলপতিগণকে কাটিয়া ফেলাতে, সন্তালেরা দলে বলে আসিয়া হিন্দুদিগকে মারিয়া ফেলে। তাহাতে পাহাড়গুলি প্রায় লোকশূন্য হইয়াছিল, পথিকেরা নিরাপদে পথ চলিতে পারিত না।

ক্লেবলণ্ড সাহেব সন্তালদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। যে সকল দলপতি ও তাহাদের সঙ্গে যে সকল স্ত্রীলোক ও পুরুষ আসিত, সাহেব তাহাদিগকে পুরস্কারস্বরূপ টাকা ও কাপড় দিতেন। যাহারা তীর চালাইতে জানিত, তিনি তাহাদিগকে ও দলপতিগণের আত্মীয়গণকে তাহাদের সেনাপতি করিয়া নিযুক্ত করিতেন। গ্রামের মোড়-লেরা বেতন পাইত, এবং গ্রামের কেহ কোন দোষ করিলে, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া সকলে মিলিয়া বিচার করিত। সাহেব মোড়লদিগকে ভোজ দিতেন।

২৯ বৎসর বয়সে ক্লেবলণ্ডের মৃত্যু হয়। পাহাড়ী ও সমভূমিনিবাসী লোকে বহুকাল ভক্তিভাবে তাঁহার নাম স্মরণ করিত। লোকেরা পাগদার আকারে তাঁহার স্মরণার্থ একটী মন্দির নির্ম্মাণ করে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট আর একটী স্মরণচিহ্ন স্থাপন করেন। তাহাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত আছে;—

"আগষ্টস্ ক্লেবলণ্ড সাহেবের স্মরণ চিহ্ন। ইনি ভাগলপুর ও রাজমহল জিলার কালেক্টর ছিলেন। রক্তপাত ও ভয় প্রদর্শন না করিয়া, ধৈর্য্য, বিশ্বাস ও দয়াসূচক উপায় অবলম্বন করত রাজমহলের জঙ্গলনিবাসী অসভ্য ও অত্যাচারী লোকদিগকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছিলেন। যাহারা মধ্যে মধ্যে সমভূমিতে আসিয়া লুট পাঠ করিত, তাহাদিগকে সভ্যতার স্বাদ প্রাপ্ত করান; এবং তাহাদের মনোরাজ্য অধিকার করত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বশীভূত করেন, (ইহাই রাজ্যের স্থায়িত্ব পক্ষে যুক্তিযুক্ত উপায়) তাঁহার সম্মান ও অন্যের দৃষ্টান্ত জন্য মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত বড় লাট বাহাদুর এই স্মরণচিহ্ন নির্ম্মাণের আদেশ করেন। ক্লেবলণ্ড সাহেব ১৭৮৪ শালের ১৩ জানুয়ারি তারিখে, ২৯ বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হয়েন।"

কালক্রমে হিন্দু মহাজনেরা পর্ব্বতবাসীদিগের নিকট যাওয়াতে তাহারা টাকা ধার করিতে শিখে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভেই সন্তালদিগের অনেকে ঋণ-জালে জড়িত হইয়া পড়ে। নালিশ করিয়া বিদেশের জেলখানায় কএদ করিবার ভয় দেখাইয়া, হিন্দু বেণেরা তাহাদিগকে কার্য্যতঃ দাস করিয়া ফেলে। ১৮৫৫ সালে দক্ষিণাঞ্চলের সন্তালগণ, ৩০,০০০ সহস্র লোক, তীরধনুকসহ বলবদ্ধ হইয়া, বড় লাট সাহেবের নিকট আপনাদের দুঃখ কষ্ট জানাইবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করে। তথা হইতে কলিকাতা এক শত ক্রোশ দূরে। প্রথমে সুশৃঙ্খলা মতে সকলেই চলিয়াছিল, কিন্তু পথ অতি দীর্ঘ, কি খাইয়া বাঁচে? লুট পাট আরম্ভ হইল, পুলিশের সঙ্গে বিবাদ

বাধিল; এক সপ্তাহের মধ্যে তাহারা সকলে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বিদ্রোহদমন হইল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ইহাতে অনেক রক্তপাত হইয়াছিল। শেষে তাহাদের দুঃখ কষ্টের অনুসন্ধান করতঃ গবর্ণমেণ্ট আইনাদির আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। তাহাতে বহু বৎসর হইতে সন্তালদের বিলক্ষণ মঙ্গল হইয়া আসিতেছে।

ভাগলপুরের ১৫ ক্রোশ পশ্চিমে মুঙ্গের, এখানে গঙ্গার তীরে একটী পুরাতন দুর্গ আছে।

পাটনা নগর গঙ্গার তীরে, বিহারে এত বড় নগর আর নাই। ১৮৯১ সালে নিবাসী সংখ্যা ১৬৮,০০০ ছিল। এটী অতি প্রাচীন নগর। সে কালে ইহার নাম পাটলিপুত্র বা পালিবর্ত্ত ছিল; খ্রীষ্ট জন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্ত রাজার দরবারে গ্রীক দেশীয় এক জন রাজদূত আইসেন; তিনি এই নগরের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা এক সময়ে বৌদ্ধ-মগধ-রাজ্যের রাজধানী ছিল। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অবলম্বন করত গোঁড়া বৌদ্ধ হইয়া পড়েন। তিনি বৌদ্ধ উদাসীনগণের জন্য এত "বিহার" বা মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দেন যে, আজি পর্য্যন্ত এই দেশ বিহার নামে খ্যাত। অশোক রাজা পাটনা নগরে বৌদ্ধ উদাসীনদিগের তৃতীয় মণ্ডল বা সভার আহ্বান করেন। তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানের পাহাড়ের গায়ে প্রাণীহত্যা নিবারণসূচক অনুশাসন বাক্য খুদাইয়া দেওয়ান; এবং নানা দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ করেন।

ইদানীন্তন এখানে দুইটী চিরস্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছে।—১৭৬৩ সালে পাটনা নগরে মীরকাশিমকর্ত্তৃক ইংরাজদিগের হত্যা ও ১৮৫৭ সালে দানাপুরে সিপাহি-বিদ্রোহ।

পাটনা নগরের এক্ষণকার অধিকাংশ বাটীই মাটীর দেওয়াল ও খোলার ছাত; তবে মধ্যে মধ্যে পাকা বাড়ীও আছে। একটী মাত্র প্রশস্ত পথ আছে, নহিলে সকল রাস্তাই অতি সঙ্কীর্ণ, বাঁকা ও বিশৃঙ্খল। শীতকালে ধূলায় চক্ষু মেলা দুষ্কর, বর্ষাকালে রাস্তায় কাদা। গবর্ণমেন্টের সে কেলে গুদাম ঘর বড় আশ্চর্য্য। পাটনার কলেজ-বাটী কিন্তু বড় সুন্দর, এটী পাকা। নগরের পূর্ব্ব দিকে দেড় ক্রোশ দূরে কতকগুলি বাটীতে সরকারি আফিমের কারখানা।

বাঁকিপুরে কাছারী ইত্যাদি, ও হাকিম এবং উকিল, মোক্তারদের বাস; পাটনা নগর হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে; দানাপুরে সৈন্য থাকে, এস্থান নগর হইতে তিন ক্রোশ দূর।

বুদ্ধগয়া।

গয়া সুবিখ্যাত তীর্থস্থান; রেল-পথে ২৮ ক্রোশ; এ নগর বাঁকিপুরের দক্ষিণে। গয়ার মন্দিরাদি পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে শাক্যসিংহের ধর্ম্ম দূরীভূত হইলে, ব্রাহ্মণেরা সে সকল অধিকার করিয়া বৈসেন, আজি পর্য্যন্ত তাঁহারাই ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন
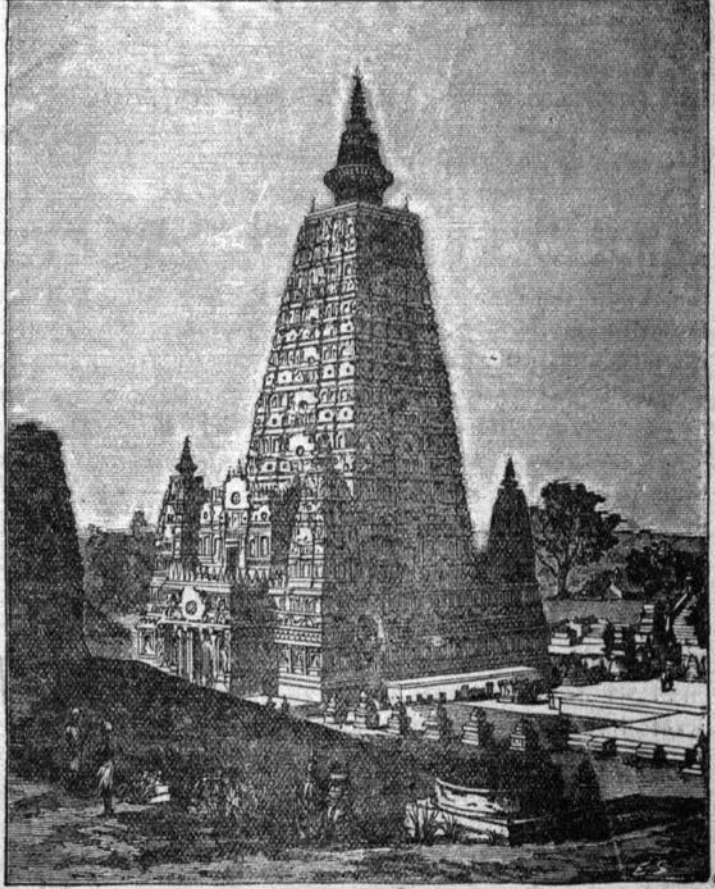
পিতৃগণের প্রীত্যর্থে হিন্দুরা গয়াতে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। গয়াতীর্থে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড দান করিলে, পিতৃগণের আত্মা যে খানেই থাকুক না কেন, তদ্দণ্ডে বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন করে। খরচ বিস্তর। গয়াতে ৪৫ টী পুণ্য স্থান আছে, ইহার সকল স্থানেই পিণ্ড দান করিতে হয়। ব্রাহ্মণকেও দক্ষিণা দিতে হয়। ব্রাহ্মণে মন্ত্র না পড়াইলে ত পিণ্ড দান হয় না! গয়ালী ঠাকুরদের পেট ভরান আর এক দায়। ধনী লোক পাইলে ত গয়ালী ঠাকুরেরা তাহার রক্ত শুষিয়া খান, এক একটা গয়ালী হাতির মত মোটা।

হিন্দুরা মনে করেন, উত্তমরূপে শ্রাদ্ধ হইলেই, পরকালে সুখ শান্তি লাভ হয়, এই জন্য অনেকে দুষ্কর্ম করিতে ভীত হয় না, ভাবে যে টাকা রাখিয়া যাইব, তাহা দিয়া শ্রাদ্ধ করিলেই স্বর্গলাভ হইবে। লোকের বিশ্বাস এই যে, নিঃসন্তান লোকেরা মরিলে পর, পুৎনামক নরকে যায়। এই বিশ্বাস অমূলক। এই মর্ত্ত্য জীবনে যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করে, তদনুসারে পরকালে তাহার বিচার হয়। শ্রাদ্ধ দ্বারা কোন উপকার হয় না। মূর্খ লোকের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য ধূর্ত্ত লোকেরা নানা প্রকার শ্রাদ্ধের কল্পনা করিয়াছে।

পাটনার উত্তর দিকে গঙ্গার অপর তীরে ত্রিহুৎ জিলা; পূর্ব্বকালে ইহার নাম ছিল মিথিলা। ১৮৭৫ সালে এই জিলা ভাগ করিয়া, দ্বারভাঙ্গা ও মজফরপুর জিলা হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গার রাজা অতি ধনবান ও সুশিক্ষিত। ত্রিহুৎ জেলায় বিস্তর নীল জন্মে। মাটির সহিত জল মিশাইয়া, সেই জল বাহির করত সিদ্ধ করিয়া লোকে সোরা প্রস্তত করে। এই অবস্থায় সোরা কিনিয়া আর এক দল লোকে তাহা পরিষ্কার করিয়া লয়। ত্রিহুৎ রেল-পথ দ্বারা দ্বারভাঙ্গা ও মজফরপুর গঙ্গার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

## ছোটনাগপুর।

বিহার ও মধ্য-প্রদেশের মধ্যস্থ দেশ ছোটনাগপুর, পর্ব্বতময়। ইহার পরিমাণ বিহারের তুল্য; কিন্তু লোকসংখ্যা ৫০০০০০০ লক্ষ মাত্র, অধিকাংশই আদিমনিবাসী।

দেশের অধিকাংশ অধিত্যকা-ভূমি, সমুদ্র হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ উচ্চ। মহারাষ্ট্রদিগের অত্যাচারে এই দেশের অনেক অনিষ্ট হইয়া গিয়াছে, দেশের অধিকাংশ ভূমি আজিও জঙ্গলময়। পরেশনাথ পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, সমুদ্র হইতে ৪৫০০ ফুট উচ্চ। এই পর্ব্বতে জৈনদিগের মন্দির আছে।

জৈন সম্প্রদায় অনেক বিষয়ে বৌদ্ধদিগের সদৃশ। ইহারা সৃষ্টিকর্ত্তা মানে না, কতকগুলি লোক সকল বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া, নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদিগের আরাধনা করে। তাহারা মনে করে, পরেশনাথ নামক জীন্ এই পর্ব্বতে পরলোক প্রাপ্ত হন, এই জন্য তাহারা এই পর্ব্বতে গিয়া তাঁহার আরাধনা করে। জৈনদিগের প্রাণীহত্যা করিতে নাই। ইহাদিগের পুরোহিতেরা মুখে কাপড় দিয়া চলে, পাছে কোন পোকা মুখে গিয়া উদরস্থ হয়। তাহারা ঝাঁটা হাতে করিয়া চলে, পথে পীপড়া দেখিলে, ঝাঁটি দিয়া চলিয়া যায়। আবার পীপড়া, কপোত, কাক ইত্যাদিকে জৈনেরা আহার দেয়, এবং পীড়িত গরু, ঘোড়া, কুকুর বিড়াল ইত্যাদির জন্য অনেকে হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছে, তাহাকে পিঞ্জরপোল বলে। বিছানায় ছারপোকা হইলে, ধনবান জৈনেরা পয়সা দিয়া লোক আনিয়া আপনাদের বিছানায় শোয়ায়, তাহাদের রক্ত খাইয়া ছারপোকার পেট ভরিলে, আপনারা শুইয়া আরাম করে। ইহাদের মতে একটী মশা মারিলেও ভয়ানক পাপ হয়। ইহারা আপনাদিগকে অতিশয় সাধু ও অপর লোককে অসাধু মনে করে।

ছোটনাগপুরের ভিন্ন ২ জাতীয় লোকে ভিন্ন ২ ভাষায় কথা কহে। সন্তালি ভাষার ন্যায় তাহাদের কোন কোন ভাষা কলারীয় শ্রেণীভুক্ত। মুন্দারী এবং কোল এই শ্রেণীর ভাষা। উরাওন জাতীয় লোকেরা যে ভাষা কহে, দক্ষিণ অঞ্চলের ভাষার সহিত তাহার সম্বন্ধ দেখিতে পাই। ইহারা বড় পরিশ্রমী। অনেকে কলিকাতায় আসিয়া নর্দ্দমা পরিষ্কার করে, তাহাদিগকে ধাঙ্গড় কহে।

যুয়াঙ্গ নামে এক জাতীয় জঙ্গলী লোক আছে, তাহারা বড়ই অসভ্য। পৃথিবীতে লোহা নামে যে এক অতি কাজের পদার্থ আছে, অতি অল্প দিন হইল, তাহারা তাহা জানিতে পারিয়াছে। তাহারা সুতা কাটিতে বা কাপড় বুনিতে অথবা মাটী দিয়া হাঁড়ী কলসী প্রস্তত করিতে জানে না। স্ত্রীলোকেরা গাছের পাতা সেলাই করিয়া সম্মুখে ও পশ্চাৎ দিকে ঝুলাইয়া দেয়। ইহাদের বিশ্বাস এই যে, কাপড় পরিলে বাঘে খায়। গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে অমনি কাপড় দিয়াছেন এবং স্ত্রীলোকদিগকে কাপড় পরাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

## উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও অযোধ্যা।

এই দুই অঞ্চলের অধিকাংশ ভূমি সমতল, গঙ্গা ও যমুনা এবং এই দুই নদীর নানা শাখা নদী এই দুই

প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। ইহাতে ৫৩,০০০ বর্গ ক্রোশ ভূমি ও প্রায় ৫ কোটী লোক আছে। লোকসংখ্যা ধরিলে, ইংরাজ অধিকৃত প্রদেশের মধ্যে এই প্রদেশদ্বয় দ্বিতীয় এবং আকারে পঞ্চম।

১৭৭৫ সালে ইংরাজেরা কাশী জিলা গ্রহণ করেন, এবং অন্য জিলা সকল এই শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাপ্ত হন। ১৮৩৩ সালে বঙ্গ-রাজধানীর জিলা সকল নিম্ন প্রদেশ এবং উচ্চ প্রদেশ, অথবা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ১৮৭৭ সালে অযোধ্যা প্রদেশ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সামিল হয়।

এই দুইটী প্রকাণ্ড প্রদেশের বিষয় পৃথক্ পৃথক্ বর্ণন করিব।

## উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল।

অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় এই প্রদেশ অযোধ্যা প্রদেশকে প্রায় বেষ্টন করিয়া আছে। ইহাকে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল বলা যাইতে পারে না, ইহা সে কালের বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির উত্তর পশ্চিম অঞ্চল।

ইহার পরিধি ৪১,০০০ হাজার বর্গ ক্রোশ—প্রকৃত বঙ্গদেশ অপেক্ষা অনেক বড়। লোকসংখ্যা ৩ কোটী ৩০ লক্ষ। এ দেশের নিবাসীদিগকে হিন্দুস্থানী বলে। শীতকালে বেশী শীত পড়ে, লোকেরা রুটী খায়। তাহারা বাঙ্গালি অপেক্ষা দীর্ঘকায় ও বলবান।

ইহাদের ভাষা উর্দ্দু ও হিন্দি। সাত কোটী লোকে এই ভাষা ব্যবহার করে। রাজমহল পাহাড়ের পশ্চিম দিকে গঙ্গার দুই তীরে যত লোক বাস করে, তাহারা এই দুই ভাষা কহে। স্থান বিশেষে ভাষার বিশেষ গ্রাম্য ভাব আছে। সংস্কৃত অক্ষরে হিন্দী ভাষায় অনেক পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। মহাজন ও দোকানদারে টানা কায়েথি অক্ষরে এই ভাষা লেখে।

উর্দ্দু ভাষা হিন্দীর রূপান্তর মাত্র, কেবল সহরের লোকেরা ব্যবহার করে। মুসলমান সিপাহিরা কতকগুলি আরবি ও পারস্য কথা হিন্দীর সঙ্গে মিশাইয়া উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা হিন্দুদের ভাষা নহে, প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের দেশী সিপাহী এবং মুসলমানেরা এই ভাষায় কথা কহে। প্রায় আড়াই কোটী লোকে এই ভাষার ব্যবহার করে। আরবী অথবা পারসী অক্ষরে উর্দ্দু ভাষা লিখিত হয়, আজি কালি অনেকে রোমীয় অক্ষরে লিখিয়া থাকে।

নিবাসীদিগের আট জনের মধ্যে এক জন মুসলমান, আর প্রায় সকলেই হিন্দু।

পাঠক, এক্ষণে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা উজাইয়া চলুন। এই প্রকাণ্ড প্রদেশের বিষয় আরও জানিতে পারিবেন।

পাটনা হইতে উজাইয়া কিছু দূর গেলে, দক্ষিণ দিকে গাজিপুর। এখানকার গোলাপ জল অতি বিখ্যাত। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যত অহিফেণ জন্মে, তাহা এই খানে একত্রিত ও প্রস্তুত হয়। ১৮০৫ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস এই খানে পরলোক প্রাপ্ত হন। গাজিপুরের দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে ২০ ক্রোশ দূরে হিন্দুদিগের পুণ্যধাম কাশী, কিন্তু নদী-পথে গেলে ২০ ক্রোশের অধিক।
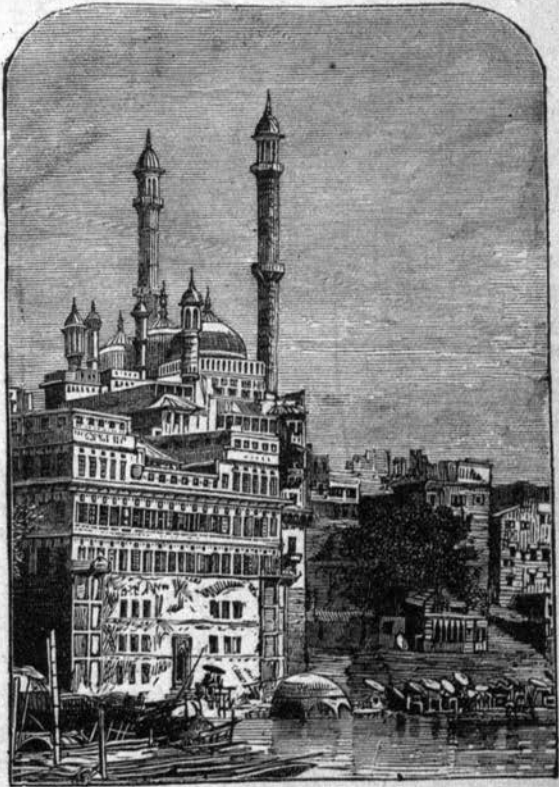
আরঙ্গজিবের মস্‌জিদ।

## বারাণসী বা কাশী।

বারাণসী হিন্দুদিগের অতি পবিত্র ধাম। ইহার মৃত্তিকা, কূপ, নদী, মন্দির এবং নিবাসী, সকলই পবিত্র। মুসলমানেরা যেমন মক্কায় যাইতে, হিন্দুরা তেমনি কাশী যাইতে ভাল বাসে।

বারাণসী নগর গঙ্গাতীরে স্থাপিত, কলিকাতা হইতে রেল-পথে ২৩৮ ক্রোশ। নগরটী গঙ্গার উত্তর তীরে

দশাশ্বমেধ ঘাট।

দুর্গাবাড়ী।
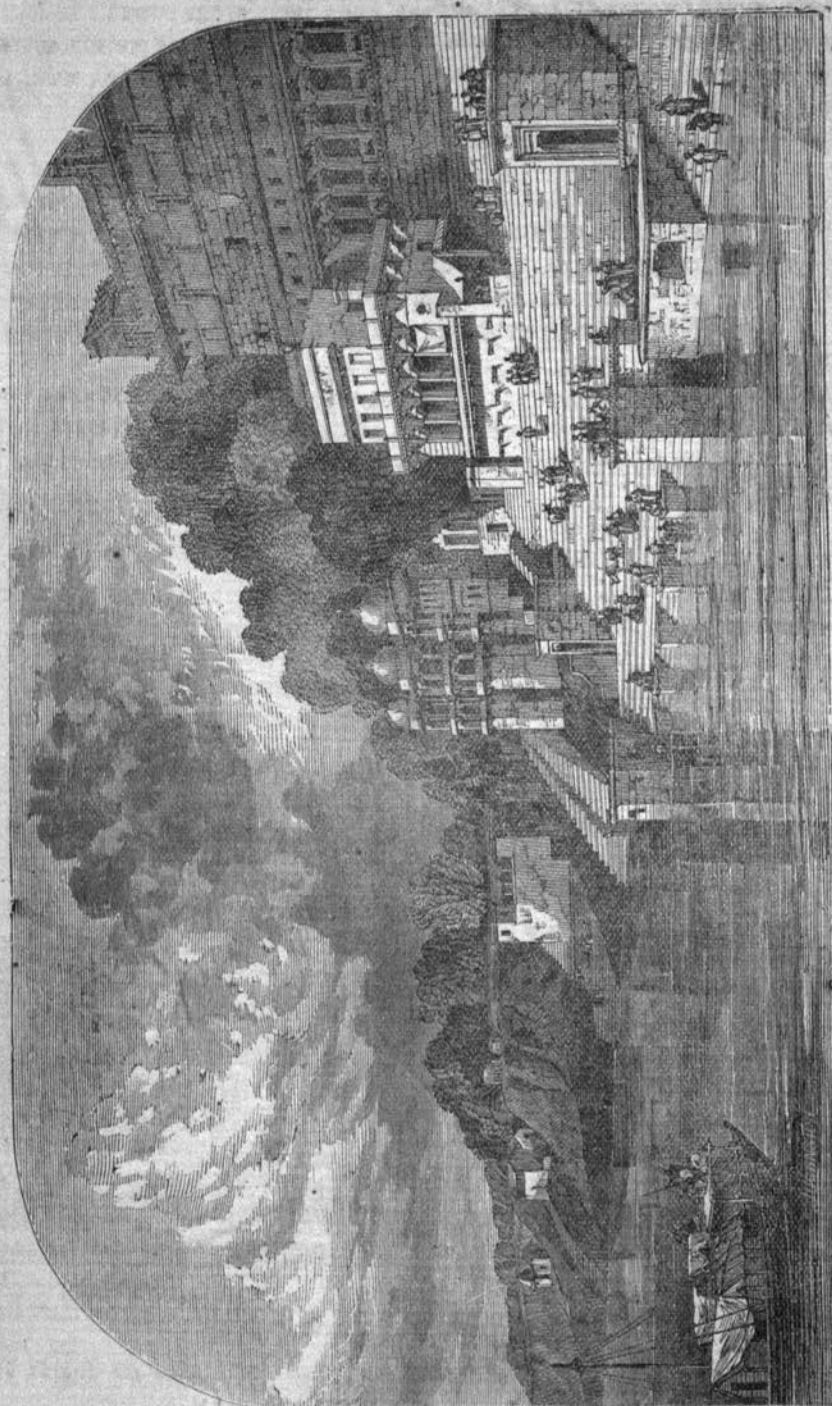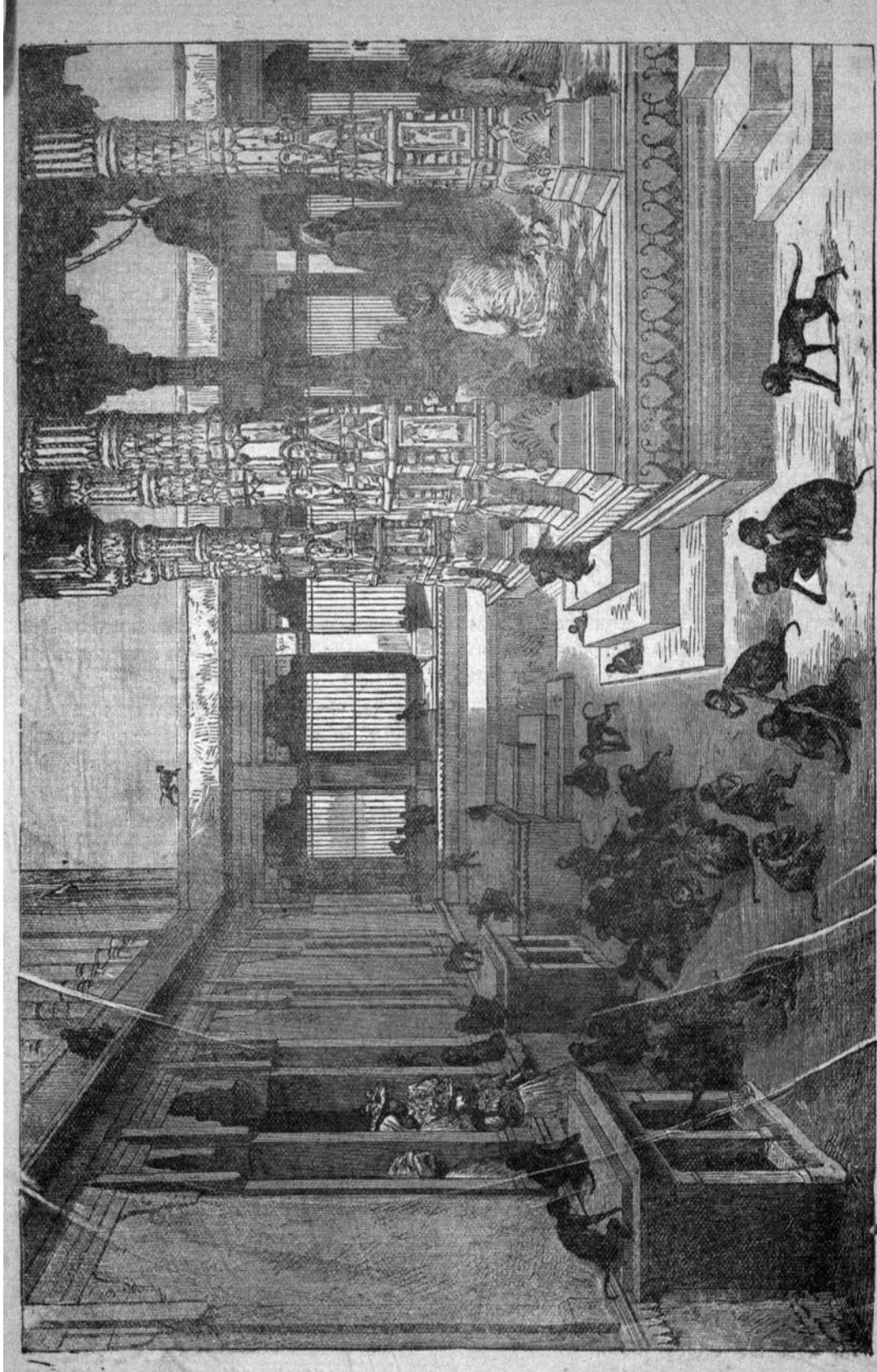
দুই ক্রোশ পথ বিস্তৃত। নগরের সম্মুখে গঙ্গা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। গঙ্গা-তীরবর্ত্তী ৭০ হাত উচ্চ একটী ছোট পাহাড়ের উপরে নগরটী স্থাপিত। নানা প্রকারের মন্দির, মস্‌জিদ ও অট্টালিকায় নগরটী পরিপূর্ণ। পাহাড়ের উপরিভাগ হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত পাথরের ধাপযুক্ত সুন্দর সুন্দর ঘাট নামিয়াছে।

পূর্ব্বে গঙ্গাতে একটী নৌকার পুল ছিল। এক্ষণে একটী অতি সুন্দর রেলওয়ে পুল আছে। হিন্দুরা ভাবিতেন, গঙ্গা ও অন্যান্য কয়েকটী পবিত্রা নদী কখনও লোহার পুলরূপ শৃঙ্খল গলায় পরিবে না। তবে কেমন করিয়া পুল হইল? হিন্দুরা বলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নরবলি দিয়া গঙ্গাকে লোহার শৃঙ্খল পরিতে রাজি করিয়াছেন। অনেক মূর্খ লোকে এ কথা বিশ্বাস করিয়া থাকে। গঙ্গার স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দিয়া কাশী নগরের প্রতি দৃষ্টি করিলে, অতি উচ্চ স্তম্ভযুক্ত আরঙ্গজিবের মস্‌জিদ চক্ষে পড়ে। মস্‌জিদটী দেখিতে পরম সুন্দর। যে স্থানে মস্‌জিদ আছে, এই স্থানে পূর্ব্বে একটী বিষ্ণুর মন্দির ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া, তাহার প্রস্তরদ্বারা আরঙ্গজিব এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। মস্‌জিদের স্তম্ভের উপর উঠিলে, নগরটীর অতি চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। প্রায় দুই শত বৎসর হইল, রাজা জয়সিংহ কাশীতে একটী মান-মন্দির নির্ম্মাণ করেন, ইহা অতি চমৎকার। তৎকালে ভারতবর্ষের লোকে দূরবীক্ষণ কি, তাহা জানিত না। সুদীর্ঘ দেওয়াল, মণ্ডল ও প্রস্তরস্তম্ভ দ্বারা জ্যোতির্ব্বেত্তারা গ্রহ নক্ষত্রগণের গতির পর্য্যবেক্ষণ ও পরিমাণ করিতেন।

বারাণসীর পথগুলি অতি বক্র, এবং কতকগুলি এত সংকীর্ণ যে, গাড়ী চলে না। অধিকাংশ বাটীই প্রস্তর-নির্ম্মিত, কোন কোন বাটী ছয় তালা। রাস্তার দুই ধারের দুই বাটী, অনেক স্থলে, উপরে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া, এক বাটী হইয়া গিয়াছে। সকল প্রকার পণ্য দ্রব্যেরই দোকান আছে। বারাণসীর পিতলের বাসন ও জরির কিংখাপ ও সাড়ী অতি বিখ্যাত।

গবর্ণমেণ্ট কলেজ বাটী প্রস্তরনির্ম্মিত, দেখিতে অতি সুন্দর। ১৮৫৩ সালে এই বাটীর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। ১৭৯১ সালে গবর্ণমেণ্ট বারাণসীতে একটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন, কিন্তু বিষয়কর্ম্মের পক্ষে সুবিধা হয় বলিয়া, লোকের ইংরাজি শিখিতেই আগ্রহ অধিক।

অগণ্য ছোট ছোট দেবালয় ছাড়াও বারাণসীতে ১৫০০ শত মন্দির ও ২০০ শত মস্‌জিদ আছে।

নগরের দক্ষিণ প্রান্তে দুর্গাবাটী নামে একটী মন্দির আছে, প্রতি মঙ্গলবারে এখানে পাঁঠা বলি হয়। এক সময়ে এই মন্দিরে বিস্তর বানর থাকিত, পুণ্য লাভ হয় বলিয়া যাত্রিরা তাহাদিগকে খাদ্য সামগ্রী দিত। এক মুষ্টি ছোলা ছড়াইয়া দিলে, চারি দিক হইতে পালে পালে বানর লাফাইয়া একটার উপর আর একটা পড়িত, আর কাড়াকাড়ি করিয়া খাইত। বানরেরা এত অনিষ্ট করিত যে, তাহা দেখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাদিগকে স্থানান্তর করিতে চেষ্টা করেন। আর একটা মন্দিরে কেবল গরু থাকে। গরুগুলি আপন মনে মন্দিরের প্রাঙ্গণে বেড়াইয়া বেড়ায়। আহা! হরিদ্বর্ণ মাঠে চরিয়া খাইতে পাইলে, ইহাদের কতই না আনন্দ হইত! পশুর আরাধনা হিন্দুধর্ম্মের অগৌরবের প্রধান কারণ।

বিশ্বেশ্বরের বা মহাদেবের স্বর্ণ-মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান, ইহারই মান্য বেশী। মহাদেব বারাণসীর রাজা। লোকে মনে করে, নগরটী তাঁহার ত্রিশূলের উপরে স্থিত। প্রকৃত মন্দিরটী অতি যৎসামান্য, কিন্তু ইহার উচ্চ চূড়া ও ছত্র সোনার ন্যায় ঝক মক করে। প্রথমে তামার পত্র, তাহার উপরে সোনার অতি পাতলা পত্র দ্বারা মণ্ডিত। শেষ সাংঘাতিক পীড়া কালে আরোগ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের আকাঙ্ক্ষায় রণজিতসিংহ উক্ত ব্যয়-ভার বহন করেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণে বহুসংখ্যক বিগ্রহ ও শিবলিঙ্গ জড় করা রহিয়াছে। আরঙ্গজিব যে পুরাতন মন্দির নষ্ট করেন, এগুলি পূর্ব্বে সেই মন্দিরে ছিল।

মন্দিরের খুব নিকটেই জ্ঞানকূপ বা জ্ঞানবাপি। লোকে বলে, মহাদেব ইহার মধ্যে বাস করেন। যাত্রিরা ফুল ও বিল্ব পত্রাদি ফেলিয়া কূপস্থ শিবের পূজা করে। এই সকল পচিয়া কূপ হইতে অতি জঘন্য দুর্গন্ধ নির্গত হয়।

মণিকর্ণিকা কূপ আরও পবিত্র! স্বয়ং বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা এই কূপ খনন করতঃ জলের পরিবর্ত্তে নিজ শরীরস্থ ঘর্ম্মধারা ইহা পূর্ণ করেন। শিব কূপ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখেন, কোটি সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। এ দিকে যে মণিকর্ণিকা নামক কর্ণাভরণ কূপে পড়িয়া গিয়াছে, আনন্দপ্রযুক্ত তাহা টের পান নাই। তাই নাম হইল মণি-কর্ণিকা। ইহার আর এক নাম মুক্তিক্ষেত্র। লোকের বিশ্বাস, এই কূপের পচা জলে জন্মার্জ্জিত সমস্ত পাপের স্খালন হয়, এই জন্য যাত্রিরা প্রথমে এই স্থানে যায়।

দশাশ্বমেধ আর একটী ঘাটের নাম, এই ঘাটে ব্রহ্মা দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, এই রূপ প্রবাদ। আরঙ্গ-জিবের মস্‌জিদের নিকটেই পঞ্চগঙ্গা ঘাট; এখানে পাঁচটী নদীর সঙ্গম স্থান, কিন্তু আমরা এক গঙ্গা বই আর কোন নদীর চিহ্ন দেখিতে পাই না।

কাশীর মন্দির। শবদাহ করিবার ঘাট।

সমস্ত বৎসর ধরিয়া দলে দলে যাত্রি ও সন্ন্যাসী নানা দেশ হইতে কাশীতে আইসে এবং চলিয়া যায়; যোগের সময়ে লোকের অত্যন্ত সমারোহ হয়। ছোট ছোট ভাণ্ডে করিয়া লোকে গঙ্গাজল দেশে লইয়া যায়।

গঙ্গা হইতে পঞ্চক্রোশী রাস্তা পর্য্যন্ত বারাণসী নগর—পবিত্র স্থান। এই গণ্ডীর মধ্যে যে কোন ব্যক্তি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, সে হিন্দু, মুসলমান, অথবা খ্রীষ্টীয়ান হউক, সাধু কি অসাধু, চোর কি ডাকাইত, বা কুণি হউক, নিশ্চয় তাহার স্বর্গলাভ হইবে। এই জন্য যে মহাজনেরা সমস্ত জীবন দরিদ্রের রক্তশোষণ করিয়া খায়, অথবা যাহারা চিরজীবন চুরি ও ডাকাতি করিয়া, অর্থসংগ্রহ করে; এই প্রকার লোকেরা মৃত্যু সন্নিকট হইলে, কাশীতে গিয়া বাস করে, এবং সমস্ত পাপের মার্জ্জনা হইল ভাবিয়া মনকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেয়।

গঙ্গাতোয়েন কৃৎস্নেন মৃদ্ভারৈশ্চ নগোপমৈঃ।
আমৃত্যোঃ স্নাতকশ্চৈব ভাবদুষ্টো ন শুধ্যতি॥ শুদ্ধিতত্ত্ব।

ইহার অর্থ এই, গঙ্গাজলে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্নান করিলে ও পর্ব্বতাকার গঙ্গামৃত্তিকা গাত্রে লেপন করিলেও দুষ্টস্বভাব পরিবর্ত্তন হয় না।

বুদ্ধিমান হিন্দুরা বিলক্ষণ জানেন, এ প্রকার আশা ভ্রম মাত্র। বারাণসীর দোকানদারেরা প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করে, অথচ দোকানে গিয়া, মিথ্যা কহিয়া লোকদিগকে ঠকায়। গঙ্গাপুত্র নামে এক দল ব্রাহ্মণ আছে, তাহারা কেমন করিয়া যাত্রিগণের রক্তশোষণ করে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

শত শত বৎসর কাল বারাণসী নগরে বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল। নগরের নিকটেই শারনাথ নামে একটী স্থান আছে, খ্রীষ্ট জন্মের ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব এই খানে আপন ধর্ম্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। যে স্থানে থাকিয়া তিনি প্রচার করিতেন, সেই স্থানকে মৃগ-কানন বলিত, বৌদ্ধ-মন্দিরের অনেক ভগ্নাবশেষ এই খানে দেখিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা হইতে বারাণসী ২৩৫ ক্রোশ, তৃতীয় শ্রেণীর রেল ভাড়া ছয় টাকা। বম্বে হইতে ৪৭২ ক্রোশ, ভাড়া ১২৸৶০ আনা, মান্দ্রাজ হইতে ৭৭৫ ক্রোশ, ভাড়া ২৩৸৶০ আনা।

আরও উজাইয়া গেলে, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে চুনার নামক স্থান পাওয়া যায়। এখানে বহুকালের একটী দুর্গ আছে। গৃহনির্ম্মাণের জন্য লোকে এই স্থান হইতে বারাণসীতে পাথর লইয়া যায়। চুনার হইতে ১০ ক্রোশ পশ্চিমে মির্জ্জাপুর। পূর্ব্বে এখানে অনেক শস্যের ক্রয়বিক্রয় হইত, কিন্তু রেল-পথ হওয়াতে সে প্রকার বাণিজ্য অন্য স্থানে উঠিয়া গিয়াছে। এই জিলার দক্ষিণ অংশ পর্ব্বতময়, এবং কোন কোন স্থান এমন জঙ্গলপূর্ণ যে তাহাতে বাঘ বাস করে।

## আলাহাবাদ, বা প্রয়াগ।

আলাহাবাদ, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের রাজধানী, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থানে স্থিত। এটী অতি প্রাচীন সহর। আলাহাবাদের চতুর্দ্দিকবর্ত্তি অঞ্চলকে মহাভারতে বারণাবত বলে, এই প্রদেশে বিখ্যাত পাণ্ডবেরা বনবাস করেন। খ্রীষ্ট জন্মের ২৪০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ রাজা অশোক নিজ নির্ম্মিত দুর্গ মধ্যে ২৮ হাত উচ্চ একটী প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করেন, তাহা হইতে আলাহাবাদসম্বন্ধীয় প্রাচীন সংবাদ যাহা কিছু পাওয়া যায়। ১১৯৪ সালে পাঠানেরা এই নগর দখল করেন। ১৫২৯ সালে বাবর পাঠানদিগের নিকট হইতে এই নগর কাড়িয়া লয়েন। ১৫৭৫ সালে আকবর বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ইহার আলাহাবাদ নাম রাখেন। অনন্তর অনেক পরিবর্ত্তনের পর অযোধ্যার নবাব ১৮০১ সালে এই নগর ইংরাজহস্তে সমর্পণ করেন। ১৮৫৮ সালে বিদ্রোহিতা দমন হইলে আগরা হইতে রাজধানী উঠাইয়া আলাহাবাদে আনীত হয়।

নগরের যে অংশে দেশীয় লোকদিগের বাস, সে অংশের পথ ঘাট অতি সঙ্কীর্ণ—মধ্যে মধ্যে দুই একটী বড় রাস্তাও আছে। যে অংশে ইংরাজদের বাস, সে অংশের রাস্তা প্রশস্ত, তাহাতে দুই বেলা জল দেওয়া হয়, এবং তাহার দুই ধারে বৃক্ষশ্রেণী। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থান হইতে তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত নগরটী বিস্তৃত; ইহার মধ্যে কাছারি, সৈন্যাবাস ইত্যাদি। এক্ষণকার অট্টালিকার মধ্যে মিয়র কলেজের বাটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ১৮৮৭ সালে আলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যবস্থাপক সভা স্থাপিত হয়। খস্রুবাগ নামক স্থানে জাহাঙ্গির বাদশার বিদ্রোহী পুত্র খস্রুর সমাধি মন্দির আছে। আগ্রার তাজমহলের ভাবে এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত; মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড গম্বুজ, ভিতরের দেওয়ালে নানা জাতীয় পক্ষী ও ফলের চিত্র। খস্রুর কবরের বাম পাশে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ও দক্ষিণ পাশে মাতার কবর।

নদী হইতে দুর্গটী দেখিতে অতি চমৎকার। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থানে এটী স্থাপিত। অশোক রাজার স্তম্ভের নিকট দিয়া সিঁড়ি শ্রেণী আছে, তাহা দিয়া নামিয়া মাটীর নীচে একটী হিন্দু মন্দিরে যাওয়া যায়। এটী শিবের মন্দির; লোকে বলে, সরস্বতী নদী এই খানে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। মন্দিরের দেওয়াল গুলি এমন ভিজা যে, তাই দেখিয়া লোকে মনে করে, যথার্থই সরস্বতী নদী এই খান দিয়া গিয়াছে। এই খানে অক্ষয় বটের গুঁড়িটা আছে, লোকে বলে, এটা ১৫০০ শত বৎসরের, এখনও জীবন্ত আছে। লোকে এই বৃক্ষের পূজা করে। দিবা রাত্র এখানে আলোক জ্বলে, এক জন ব্রাহ্মণ বসিয়া উপহার গ্রহণ করেন। এক খানি কাপড় এমন করিয়া রাখা হইয়াছে যে, বৃক্ষটী ভাল করিয়া দেখা যায় না। ফলে একটা বট বৃক্ষের ডাল পুতিয়া রাখা হইয়াছে, শুকাইয়া আসিলে বদলাইয়া দেওয়া হয়। এক জন সাহেব নখ দিয়া অক্ষয় বটের বাকল কাটিয়া দেখিয়াছেন, নিতান্ত শুষ্ক এবং ভাঙ্গিয়া যায়। এই মন্দিরে মুকুন্দ নামে এক জন লোকের প্রতিমূর্ত্তি আছে। মুকুন্দ বড় সাধু পুরুষ ছিলেন। এক বার জলের সঙ্গে এক গাছি গোলোম উদরস্থ করিয়াছিলেন, এই পাপ হেতু তাঁহার মনে এমন অনুতাপ হয় যে, আত্মহত্যা করেন!

প্রয়াগের বেণী ঘাটে স্নান করিলে বড় পুণ্যলাভ হয়। শীতকালে এখানে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থানে এক
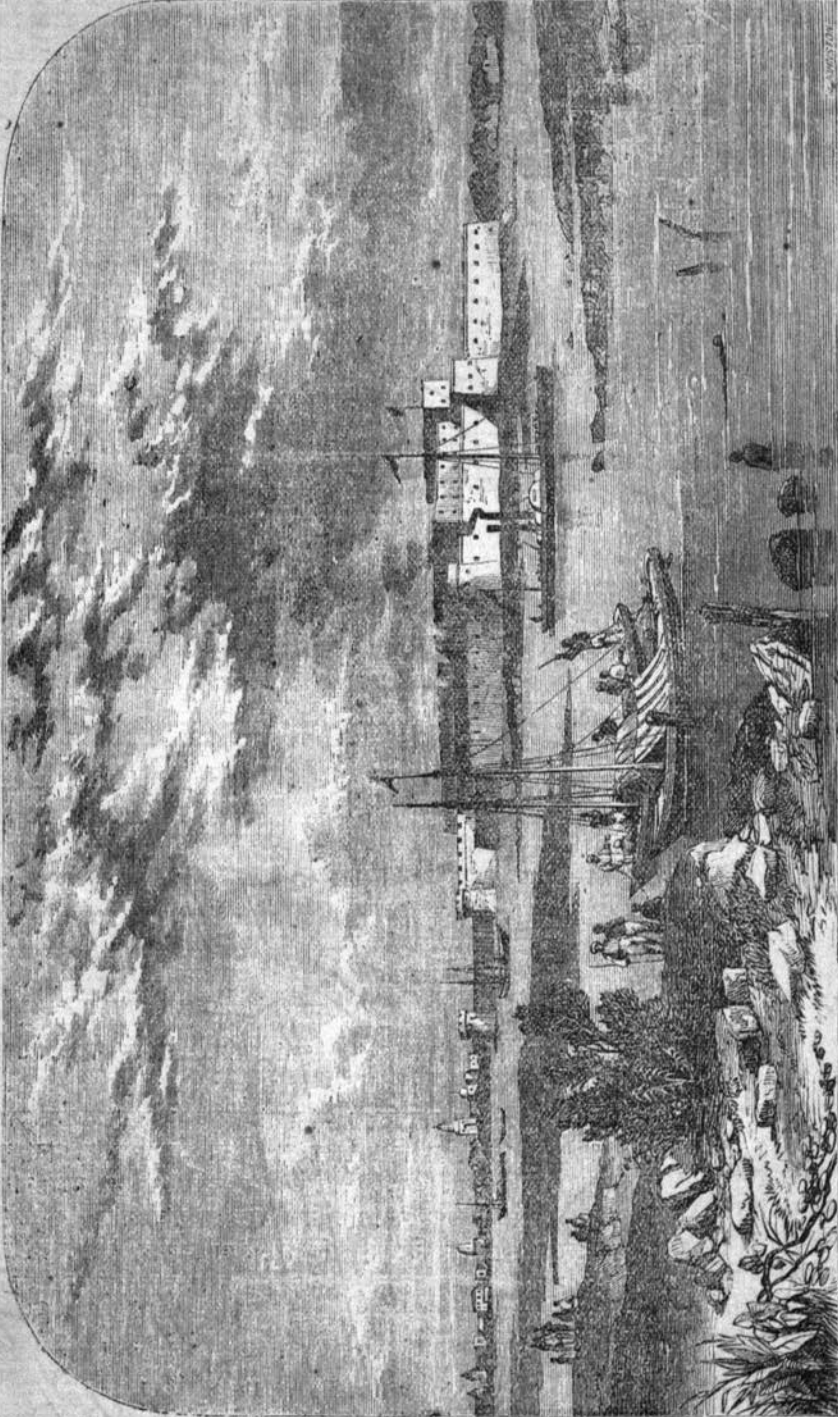
আলাহাবাদ, বা প্রয়াগের কেল্লা।

মেলা বসে, তখন নানা দেশ হইতে সহস্র সহস্র যাত্রির সমাগম হয়। সে কালে নিশ্চিত স্বর্গলাভ করিবার আশায়

গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে লোকে ডুবিয়া মরিত, কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা রহিত করিয়া দিয়াছেন। এই রূপে যাঁহাদের মরিবার ইচ্ছা হইত, তাহারা নৌকা করিয়া পুরোহিত সঙ্গে লইয়া, নদীর মধ্য স্থলে যাইত। এক হাতে শক্ত করিয়া একটা কলসি বাঁধিত, অপর হাতে একটী বাটী থাকিত। এই রূপে লোকদিগকে জলে নামাইয়া দিলে, খালি কলসিতে ভর দিয়া ভাসিত, এবং বাটী করিয়া জল তুলিয়া খালি কলসি ভরিতে থাকিত, কলসি পূর্ণ হইয়া আসিলে কলসির সঙ্গে সঙ্গে সেই অভাগারা ডুবিয়া যাইত। ইহাতে পুণ্য হইত না, বরং আত্মহত্যা করাতে মহাপাপ হইত।

আলাহাবাদ সহরের লোক সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ।
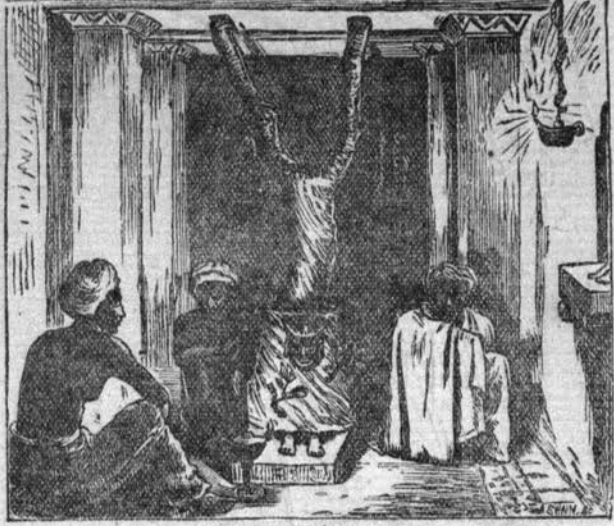
অক্ষয় বট।

## কানপুর।

আলাহাবাদ হইতে গঙ্গা উজাইয়া ৬০ ক্রোশ পথ গেলে কানপুর নগরে পঁহুছান যায়। ইহার প্রকৃত নাম কাহ্নপুর। এটী আধুনিক নগর। অযোধ্যার নিকট বলিয়া, এখানে অনেক সৈন্য থাকে, আবার অনেক গুলি রেলপথের সঙ্গমস্থান হওয়াতে নগরের নিবাসীসংখ্যা এবং বাণিজ্য কার্য্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এখানে গঙ্গার উপর দিয়া একটী চমৎকার ও প্রকাণ্ড সেতু আছে। ইহার উপর দিয়া রেলগাড়ি চলে। কানপুরে বড় ধুলা উড়ে। বেলে পাথরের খোয়া দিয়া রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে, গাড়ি ঘোড়া চলাতে খোয়া ভাঙ্গিয়া ধুলা হয়, বাতাস বহিলে সেই ধুলা উড়িয়া মেঘের আকার ধারণ করে। ধুলা জমিয়া অনেক সময়ে পথিকদিগের ভ্রূ সাদা হইয়া যায়।

১৮৯১ সালে কানপুরের নিবাসীসংখ্যা ১৮২,০০০ হাজার ছিল। নানা সাহেবকৃত ১৮৫৭ সালের নৃশংস নরহত্যা হেতু কানপুর বিখ্যাত। প্রথমে দেশী পল্টনের সিপাহিরা বিদ্রোহী হইয়া, কালেক্টরির খাজানা-খানা লুঠ করে, জেলখানার দরজা খুলিয়া কয়েদিদিগকে ছাড়িয়া দেয়, এবং ইংরাজেরা যে সকল বাঙ্গলা ঘরে বাস করিত, তাহাতে আগুন লাগাইয়া দেয়। ১৫০ জন গোরা লইয়া, সেনাপতি স্যার হিউ হুইলার সাহেব বারিকে ছিলেন, সঙ্গে ৩৩০ জন ইউরোপীয় স্ত্রীলোক ও ছেলে মেয়ে। বারিকের চারি দিকে আত্মরক্ষার জন্য কেবল চারি হাত উচ্চ মাটীর প্রাচীর মাত্র। নানা সাহেব মহরাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ, কানপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরে বিথূর নামক স্থানে বাস করিতেন। ইনি চিরকালই ইংরাজদের সঙ্গে বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন, ইংরাজদিগকে খানা দিতেন, ও শিকারে লইয়া যাইতেন। ইহাঁরই পরামর্শে সিপাহিরা স্যার হিউ হুইলার সাহেবের বারিক আক্রমণ করে। তিন সপ্তাহকাল অতিশয় সাহসসহকারে আত্মরক্ষা করত হুইলার সাহেব নিজে হত হয়েন, তাঁহার সঙ্গিরা, অনেকে মরিয়া যাওয়াতে বড় বিপন্ন হইয়া পড়েন, এমন সময়ে নানা সাহেব দিব্য করত ইংরাজদিগকে নৌকায় করিয়া, আলাহাবাদে পাঠাইবার প্রস্তাব করেন। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়াতে ইংরাজেরা সম্মত হয়েন। সকলে

আলাহাবাদের খস্রু-বাগ।
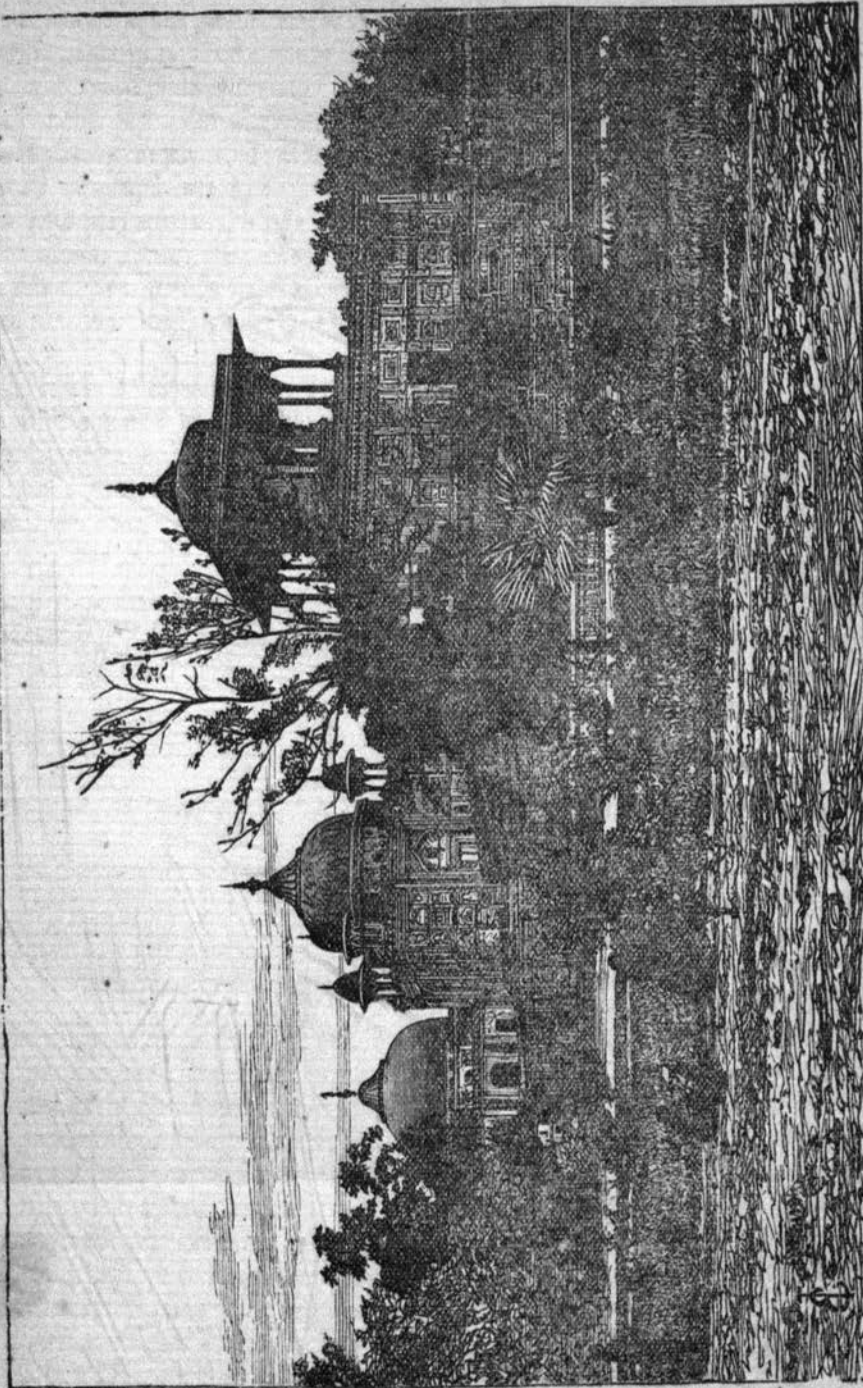
নৌকায় উঠিয়া গঙ্গার মধ্যস্থলে যাইতে না যাইতে সিপাহিরা বন্দুক ছুড়িতে আরম্ভ করে। তাহাতে সমস্ত নৌকা ডুবিয়া যায়, কেবল এক খানি নৌকা রক্ষা পায়। সেই নৌকায় অনেক ইংরাজ স্ত্রীলোক এবং পুরুষ ও ছেলে মেয়ে ছিল। ইহাদের অনেকে ফতেপুর হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল। নানা সাহেবের লোকেরা সেই নৌকাখানি ধরিয়া পুরুষদিগকে বধ করে, এবং স্ত্রীলোক ও ছেলে মেয়েদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কানপুরে এক বাটীতে বদ্ধ করিয়া রাখে। বিদ্রোহিতার পূর্ব্বে এই বাটীতে হাসপাতাল ছিল।

এ দিকে স্যর হেন্‌রি হাব্‌লক সৈন্য সামন্ত লইয়া কানপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি আসিতেছেন শুনিয়া, নানা সাহেব সিপাহিদিগকে আদেশ করেন, যত ইংরাজ স্ত্রীলোক ও ছেলে মেয়ে আছে, তাহাদিগকে মারিয়া ফেল। কিন্তু তাহারা কোন মতে সম্মত হইল না। তাহাতে তিনি কসাই আনাইয়া সকলকে কাটিয়া, মৃত ও মরণাপন্ন স্ত্রীলোক ও ছেলে মেয়েদিগকে একটা কূপে ফেলিয়া দেওয়ান। ইংরাজ সৈন্যগণ কানপুরে পঁহুছিয়া দেখে, সেই ঘরটী রক্তে পরিপূর্ণ। এত স্ত্রীহত্যা ও শিশু হত্যা করাতেও নানা সাহেবের জাতি যায় নাই। কিন্তু তিনি যদি কোন ইংরাজ বালকের হাতে এক ফোঁটা জল পান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার জাতি ধর্ম্ম, সকলই নষ্ট হইত!

এই নৃশংস কাণ্ডের স্মরণার্থ সেই কূপের উপরে একটী চমৎকার স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপিত হইয়াছে। স্মরণার্থ চিহ্নটী এই রূপ;—একটী স্বর্গীয় দূত, পশ্চাদ্দিকস্থ ক্রুশের উপরে ভর রাখিয়া, বুকের উপর হাত দুখানি রাখিয়া, দাঁড়াইয়া আছেন। মনোদুঃখ হেতু যেন ডানা দুখানি ঝুলিয়া পড়িয়াছে; হাতে জয় ও ধর্ম্মবীরের চিহ্নস্বরূপ তালপত্র। স্তম্ভে লিখিত আছে;—"বিঠূর নিবাসী রাজবিদ্রোহী নানা ধন্দ পন্থের লোকেরা ১৮৫৭ সালের ১৫ ই জুলাই তারিখে যে সকল খ্রীষ্টীয়ান—অধিকাংশই স্ত্রীলোক ও ছেলে মেয়ে—দিগকে হত্যা করত, মৃত ও মরণাপন্নদিগকে এই কূপে ফেলিয়া দেয়, তাহাদের চিরস্মরণার্থ এই স্মরণচিহ্ন স্থাপিত হইল।"

যে "খ্রীষ্টীয় সাহিত্য সমিতি" দ্বারা এই পুস্তক প্রকাশিত হইল, ১৮৫৮ সালে, সিপাহী বিদ্রোহিতার স্মরণার্থ তাহার স্থাপন হয়। সুশিক্ষা ও হিতোপদেশ-পূর্ণ পুস্তক প্রকাশদ্বারা ভারতবর্ষীয় লোকদিগের মঙ্গলসাধন করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য।

কানপুরস্থ স্মরণচিহ্ন।

## অযোধ্যা।

কানপুরে রেলের পুল দিয়া গঙ্গা পার হইলেই অযোধ্যা, বা ঔদ প্রদেশে যাওয়া যায়। পুরাকালে এই দেশ সভ্য ছিল। অযোধ্যা পুরাকালের কোশল রাজ্যের রাজধানী। রামায়ণের আরম্ভেই অযোধ্যা নগরের ঐশ্বর্য্য, ও সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণে বর্ণিত সমস্ত কাহিনী সত্য বলিয়া এ দেশীয় লোকের বিশ্বাস। দুই একটী সত্য হইতে পারে; নহিলে অধিকাংশই কবির কল্পনা; যেমন দুর্গেশনন্দিনী বা রণচণ্ডীর গল্প—লোকের মনোরঞ্জনের জন্য গ্রন্থকার নানা আশ্চর্য্য ঘটনার কল্পনা করিয়াছেন। ফলে হনুমান নামে প্রকাণ্ডকায় বানরও ছিল না, আর সে পাহাড়ও মাথায় করিয়া লইয়া যায় নাই। অথবা সূর্য্যকে ধরিয়া আনিয়া বগলে লুকাইয়া রাখে নাই. লঙ্কাধিপতি রক্ষরাজ রাবণসম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণই কবির কল্পনামাত্র। লঙ্কা বা সিংহল দ্বীপ এক্ষণে ভারতেশ্বরী ভিক্টরিয়ার রাজ্যভুক্ত; সে খানেও আমাদের ন্যায় মানুষের বাস, রাক্ষসের বাস নহে। এক সময়ে কোশল রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। অনেক হিন্দু রাজবংশ এই দেশে রাজত্ব করিলে পর অবশেষে, ১১৯৪ সালে মুসলমানেরা দেশটী অধিকার করে। ১৭৩২ সালে সাদৎ আলি নামে এক জন পারস্য দেশীয় বণিক অযোধ্যার সুবাদারের পদে নিযুক্ত হয়েন। আমাদের সময় পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরেরা অযোধ্যায় রাজত্ব করেন। ১৮৫৬ সালে মহারাণী অযোধ্যা দেশ ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন। অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদালি সাহাকে কলিকাতায় আনিয়া রাখা হয়; তিনি যথেষ্ট পেন্সন
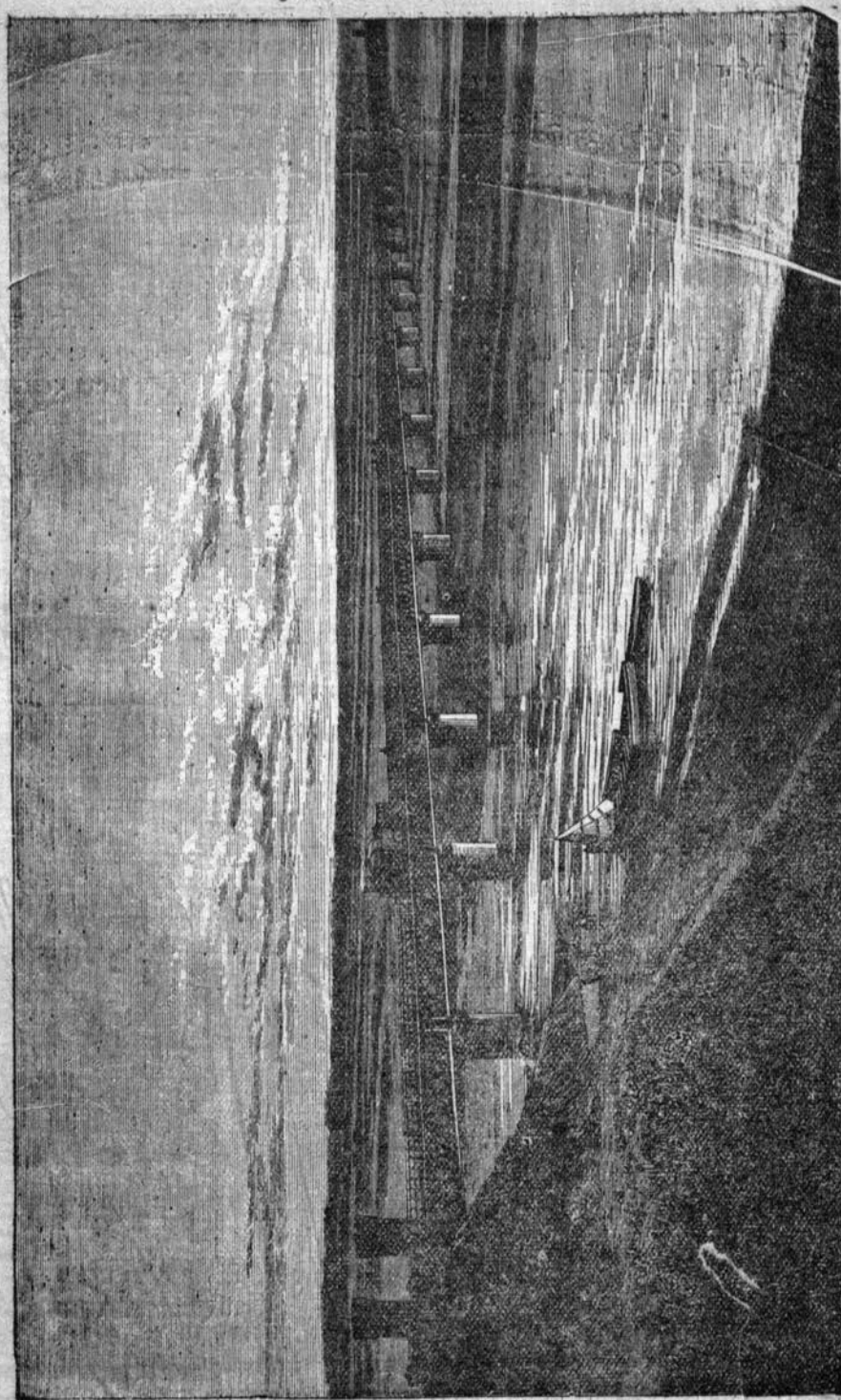
কানপুরের গঙ্গার পুল।

পাইতেন। ১৮৮৭ সালে কলিকাতার মুচিখোলা নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৭৭ সাল পর্য্যন্ত অযোধ্যা প্রদেশ এক জন প্রধান কমিশনরের অধীনে ছিল, পরে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ভুক্ত হইয়াছে।

অযোধ্যার ভূমির পরিমাণ ১২,০০০ হাজার বর্গ ক্রোশ — প্রায় লঙ্কা বা সিংহলের তুল্য। দেশটী সমভূমি, ক্রমে নিম্ন হইয়া গঙ্গা ও সমুদ্রের দিকে গিয়াছে। এই দেশের দক্ষিণ সীমানা গঙ্গা, দেশের মধ্য দিয়া গোমতী, ঘর্ঘরা ও সরযূ নদী প্রবাহিত হইয়াছে। ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বরা, পতিত জমি নাই বলিলেই হয়। লোকের বসতি বড় ঘন, লোকসংখ্যা ১,২৫,০০,০০০ লক্ষ। দশ জনের মধ্যে ৯ জন হিন্দু।

## লক্ষ্ণৌ।

অযোধ্যার রাজধানী লক্ষ্ণৌ বা লক্ষ্মণাবতী। কানপুর হইতে রেল পথে ২৩ ক্রোশ। লক্ষ্ণৌ নগরের নিকট দিয়া গোমতী নদী প্রবাহিত, নগরটী আধুনিক হইলেও নিবাসীর সংখ্যা ২৭৩,০০০। ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে আকারে মান্দ্রাজের পরেই লক্ষ্ণৌ। প্রবাদ আছে যে, রামের ভাই লক্ষ্মণ একটী নগর স্থাপন করিয়া, নিজ নামানুসারে তাহার নাম লক্ষ্মণাবতী রাখেন। কিন্তু বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌ প্রায় দুই শত বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে।

দূর হইতে লক্ষ্ণৌ নগর বড় চমৎকার দেখায়। বাড়ীগুলি অতি প্রকাণ্ড ও উজ্জল শ্বেতবর্ণ গম্বুজ ও স্তম্ভ গুলি স্বর্ণমণ্ডিত; না জানি কতই সমৃদ্ধিশালী নগর। কিন্তু নিকটে গেলে দেখিবে, তা নয়। চুণের প্রলেপদ্বারা বাটীগুলি শ্বেতবর্ণ হইয়াছে, শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত নহে। যত বাটী আছে, তন্মধ্যে ইমামবারা বা আসফ-উদ্দৌলার সমাধি মন্দির প্রধান; ১৭৮৪ সালের আকালের সময়ে এই বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাটীর মধ্যে এক প্রকাণ্ড দালান আছে। এক্ষণে এ বাটীতে অস্ত্র শস্ত্র থাকে। নদীর তীরের নিকটেই আর একটী প্রকাণ্ড বাটী আছে, ইহার নাম ছত্র-মঞ্জিল। ইহার নানা প্রকোষ্ঠ। উপরে সোনার গিল্‌টি-করা ছাতি, সূর্য্যালোকে ঝক মক করে। কাইসর-বাগ নামে আর এক অট্টালিকা আছে। তাহার দ্বারে দুইটী স্তম্ভ। এটী নির্ব্বাসিত নবাববংশের শেষ কীর্ত্তি। শা-মঞ্জিল নামক বাটীতে পশুদিগের যুদ্ধ হইত; নবাব শেষ কাল পর্য্যন্ত এই আমোদ ভোগ করিয়াছেন।

ক্লড মার্টিন নামে এক জন ফরাশি সামান্য সৈনিকের কাজ লইয়া ভারতবর্ষে আইসেন; শেষে নবাবের সেনাপতির পদ পাইয়া, অগাধ অর্থ রাখিয়া মরেন। তিনি লক্ষ্ণৌ নগরে এক সৃষ্টিছাড়া রকমের বাটী নির্ম্মাণ করত, এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহার নাম লামারটিনিয়র। এটী সহরের বাহিরে। নবাবের বাসের জন্য প্রথমে এই বাটীর পত্তন হয়; কিন্তু শেষে ইহাতে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এখানে ১২০ জন বালক অন্ন বস্ত্র ও বিদ্যাশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

লক্ষ্ণৌ নগরের ফটক দুয়ার।

লক্ষ্ণৌয়ের সুন্দর সুন্দর বাগান অতি বিখ্যাত।

রেসিডেন্সি আর একটী সুন্দর বাটী, এ বাটীর নাম করিলে কত শোচনীয় কথাই মনে পড়ে! ১৮৫৭ সালে লক্ষ্ণৌ নগরের প্রায় সহস্র ইউরোপীয় অধিবাসী — আপন আপন স্ত্রী পুত্র লইয়া এই রেসিডেন্সি বাটীতে আশ্রয় লয়েন, এবং প্রাতঃস্মরণীয় স্যর হেনরি লরেন্স সাহেব ৫০০ শত ইংরাজ, ও ৫০০ শত বিশ্বাসী সিপাহি লইয়া, ছয় মাস কাল সকলকে রক্ষা করেন। এই দীর্ঘকাল বহুসংখ্যক বিদ্রোহী সিপাহি দিবারাত্র রেসিডেন্সি লক্ষ্য করিয়া গোলা গুলি ছুড়িত।

বারুদ দিয়া বাটীটা উড়াইয়া দিবার জন্য সিপাহিরা গর্ত্ত খনন করিয়াছিল; সুরক্ষার জন্য স্ত্রীলোক, ছেলে মেয়ে, পীড়িত ও আহত লোকদিগকে বাটীর নিম্নস্থ গুদামে রাখা হইয়াছিল। এক দিন একটী বালিকা বাটীর প্রাঙ্গণে বেড়াইতেছিল, এমন সময়ে বন্দুকের গোলা মাথায় লাগিয়া বেচারা মরিয়া যায়। খাদ্যাভাবে লোকদিগের যার পর নাই কষ্ট হইয়াছিল। স্যর হেনরি লরেন্স এক দিন বারাণ্ডায় ছিলেন, এমন সময়ে কামানের

লক্ষ্ণৌয়ের গোমতীতীরস্থ রাজপ্রাসাদ।

লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সি।
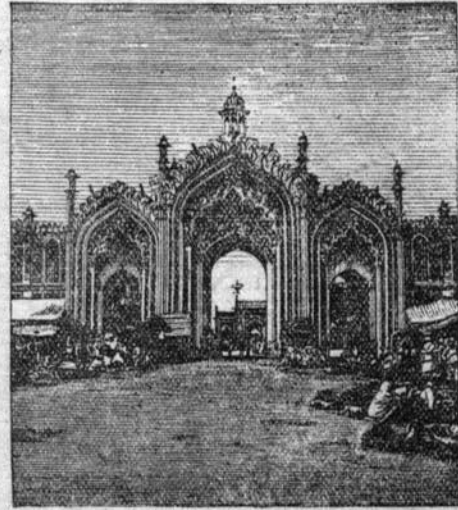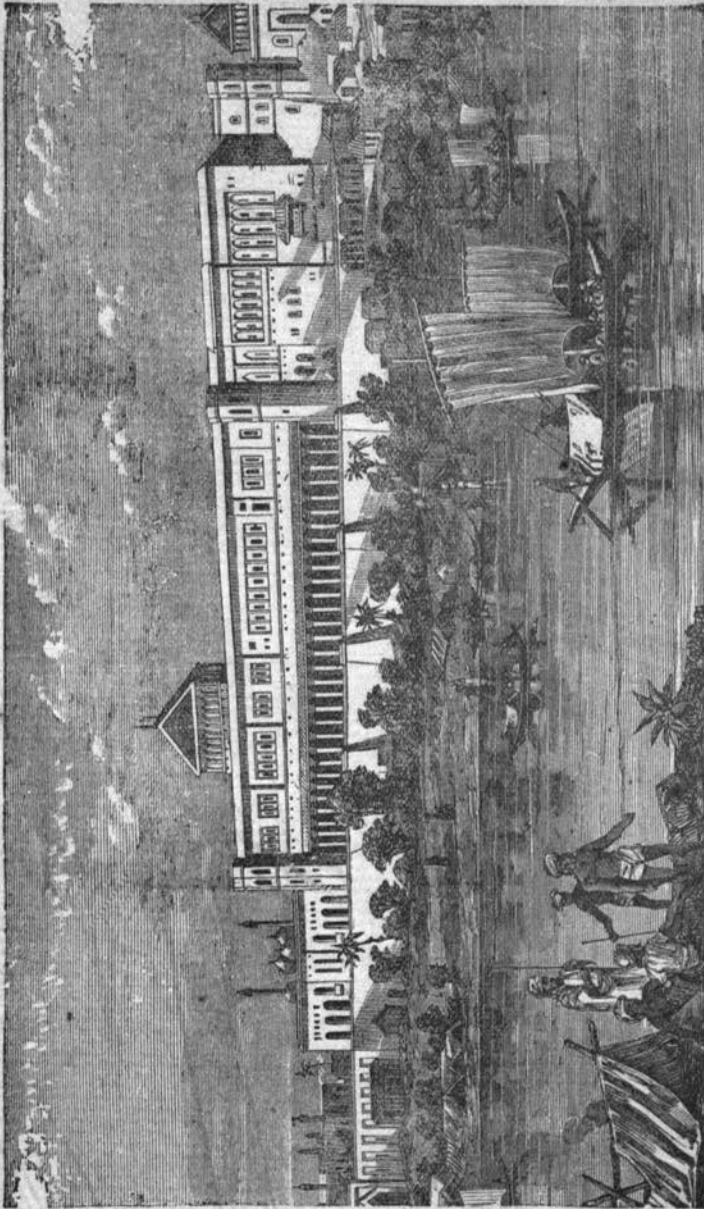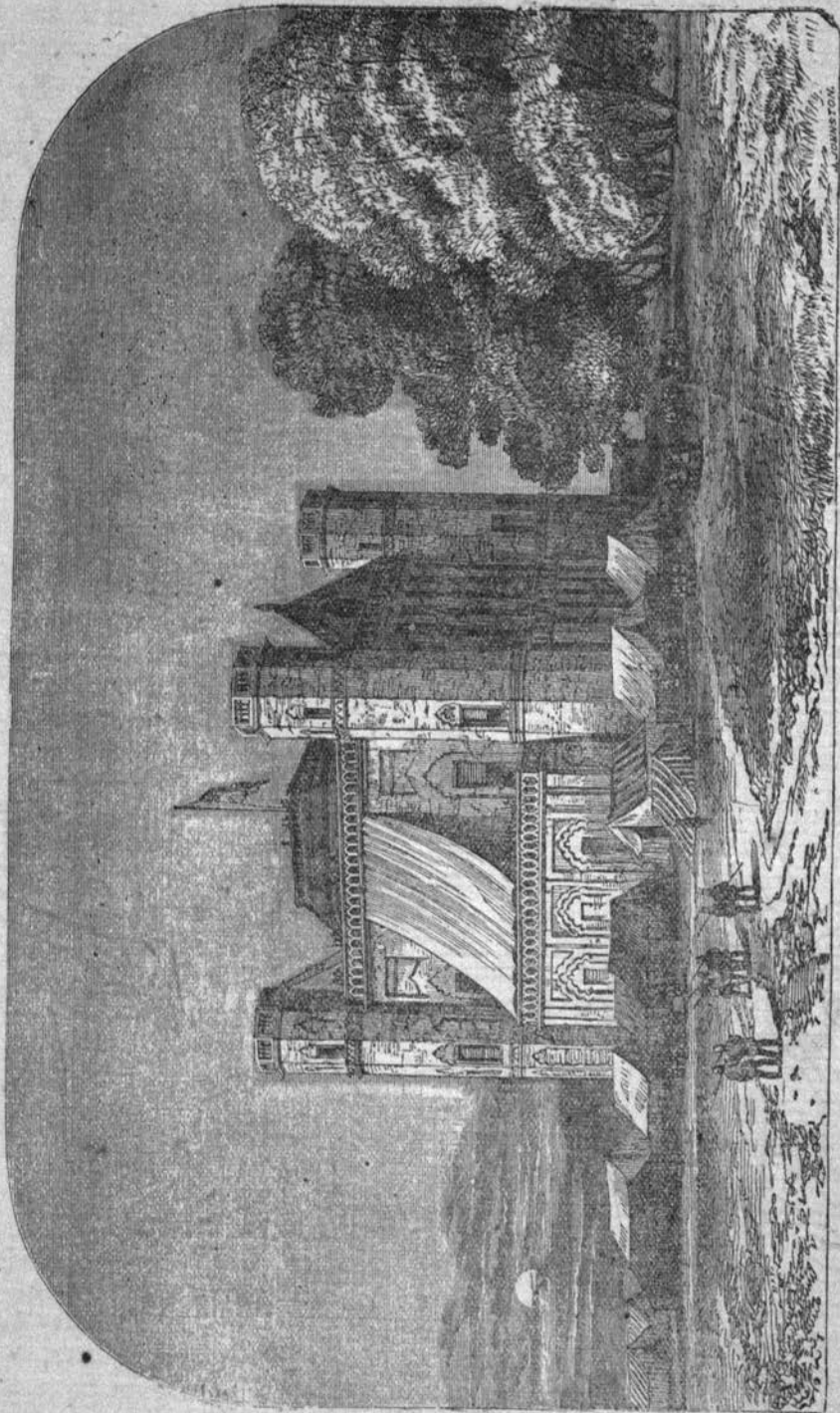
গোলা লাগিল; ইহার অল্প ক্ষণ পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে আপন ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিকটে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন, "বাবা, দেখ আসিয়া, খ্রীষ্টিয়ান কি সুখে মরে!" তাঁহার অনুরোধে তাঁহার সমাধিস্তম্ভের উপর লিখিত হইয়াছে, "এই খানে হেনরি লরেন্স শুইয়া আছে, যে কর্ত্তব্য সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।" লরেন্সের মৃত্যুর প্রায় তিন মাস পরে স্যর হেনরি হেবলক রেসিডেন্সির লোকদিগকে উদ্ধার করিতে যান। হেবলকও লরেন্সের ন্যায় যীশু খ্রীষ্টের অকপট ভক্ত ছিলেন। আহা, যে দিন রেসিডেন্সির লোকদিগের সম্পূর্ণ মুক্তি-সাধন হইল, সেই দিনই হেবলক্ স্বরলোক প্রাপ্ত হইলেন। লরেন্সকে দেখিতে হেবলকের বড়ই ইচ্ছা ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে স্বীয় বন্ধু স্যর জেমস ঔটরামকে (ইহাঁর মূর্ত্তি কলিকাতার পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে আছে) বলিয়াছিলেন, "৪০ বৎসরের অধিক কাল আমি এরূপে জীবন কাটাইয়াছি যেন, মৃত্যু আসিলে নির্ভয়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি।"

মাননীয় হেন্‌রী হেবলক্।

রেসিডেন্সি বাটী এখন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে।

এদেশের পুরাকালের হিন্দু রাজধানীর নাম অযোধ্যা, ঘর্ঘরা নদীর দক্ষিণ তীরে ছিল। পুরাতন নগরের চিহ্ন প্রায় লোপ পাইয়াছে; জঙ্গলের মধ্যে বাড়ী ভাঙ্গা ইট পাথর পড়িয়া আছে মাত্র। পুরাকালে ভারতবর্ষে এমন সমৃদ্ধিশালী নগর আর ছিল কি না, সন্দেহ। আধুনিক অযোধ্যা ও ফৈজাবাদ সাবেক নগরের কোন কোন অংশে স্থিত। আধুনিক অযোধ্যা অতি ছোট।

## জলপথে—আবার।

লক্ষ্ণৌয়ের কথা থাকুক, পুনরায় গঙ্গা দিয়া উজাইলে, ৩৫ ক্রোশ গিয়া, ২ ক্রোশ পথ পদব্রজে গেলে, কালী নদীর পশ্চিম তীরে কনৌজ বা কান্যকুব্জ। এক কালে কান্যকুব্জ এক বিশাল রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই খান হইতে গুপ্ত বংশীয় রাজারা উত্তর ভারতের অনেক অংশের উপর আধিপত্য করিতেন, এখানকার রাজার উপাধি মহারাজাধিরাজ ছিল। বোধ হয়, ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দে এই নগর সমৃদ্ধিশালিতার সর্ব্বোচ্চ সোপানে উঠিয়াছিল। ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ গজনি এই নগর দখল করেন বটে, কিন্তু লুঠ করেন নাই। ১১৯৪ খ্রীঃ অব্দে এই নগর মহম্মদ ঘোরির হস্তগত হয়। এক্ষণে নগরের স্থানে পাঁচখানি গ্রাম আছে; বাড়ী ভাঙ্গা ইট পাথর বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। সাবেক নগরের যে প্রাচীর আছে, তাহার উপরে চালা তুলিয়া দরিদ্র লোকেরা বাস করে। বঙ্গদেশের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণেরা, কনৌজ হইতে বঙ্গে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান।

কানপুরের ৫০ ক্রোশ উজানে ফরক্কাবাদ নগর। রেলপথে যাওয়া যায়। এটী আধুনিক নগর। গত শতাব্দীতে ইহা ফরক্কাবাদের নবাবের জায়গির ভুক্ত ছিল। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকালে নবাব সিপাহিদিগের সঙ্গে যুটিয়া ইংরাজদিগের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্তু কএক মাস পরে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন।

## গঙ্গার খাল।

যথা সময়ে বৃষ্টি না হওয়াতে, বা অনাবৃষ্টি হওয়াতে ভারতবর্ষের নানা স্থানের লোকদিগের দুঃখ হয়। এক শত বৎসর পূর্ব্বে লোকে মনে করিত, আকাল ঈশ্বরাধীন ঘটনা, মনুষ্যের তাহা নিবারণ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। দেশে শস্য না হইলে ত মানুষ মরিবেই, তাহার আর উপায় নাই। পৃথিবী শস্য না দিলে কাজে কাজেই মানুষ মরিবে, কে রক্ষা করিতে পারে?

গত শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে যে এক বার আকাল হইয়াছিল, তাহার বিবরণ এই;—

"সমস্তটা গ্রীষ্মকাল মানুষ মরিতেই লাগিল। চাষারা গোরু বাছুর বেচিয়া ফেলিল; লাঙ্গল যোঁয়ালি

দুঃখের চিহ্ন।
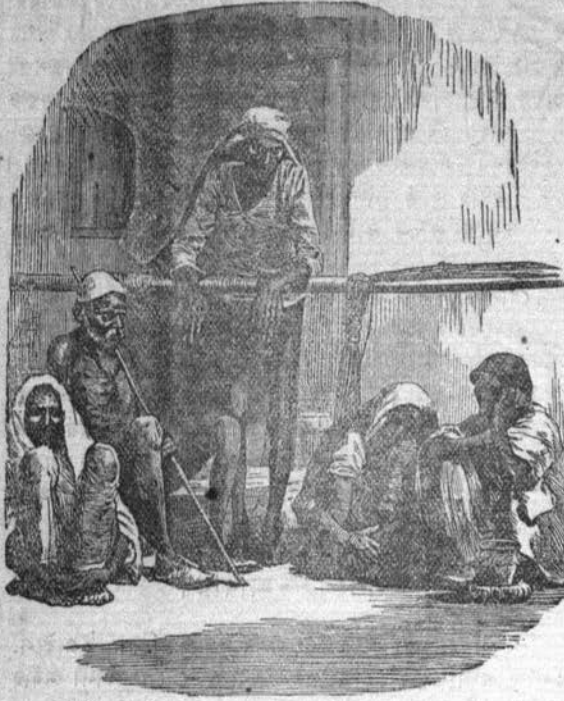
ইত্যাদি কৃষিকার্য্যের উপকরণ বেচিয়া খাইল; ছেলে মেয়ে বিক্রয় করিল, শেষে আর কেহ ছেলে মেয়ে ক্রয় করিল না; গাছের পাতা, বনের ঘাস খাইল; শেষে, আষাঢ় মাসে শুনিতে পাই, জীবন্ত মানুষে মরা মানুষ খাইতেছে। এই মহা-মন্বন্তরের দুই বৎসর পরে, ওয়ারেন হেষ্টিং মফস্সল ভ্রমণে গিয়া বলেন যে, বড় কম হইলেও ছয় আনা আন্দাজ, বা এক কোটী লোক মারা পড়িয়াছে। ইহার নয় বৎসর পরে লর্ড কর্ণওয়ালিস বলেন, বাঙ্গালার ছয় আনা জমি জঙ্গলপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।"

১৮৩৭-৩৮ সালে উত্তর-ভারতবর্ষে এক ভয়ঙ্কর আকাল হয়। ইহার বহুকাল পরেও চাষারা ঐ আকালের বৎসর হইতে আপন আপন বয়স গণনা করিত। এই জন্য ১৮৪২ সালে গবর্ণমেণ্ট খাল কাটিতে আরম্ভ করেন, এবং ১৮৫৪ সালে খাল কাটা কাজ তখনকার মত শেষ করেন। ১৮৬৬ অব্দে উক্ত খালের মূল খালটী আলাহাবাদ পর্য্যন্ত আনিবার প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়, এক্ষণে উহাকে "নিম্ন গঙ্গার খাল" বলে। উচ্চ খাল হরিদ্বারের নিকট আরম্ভ হইয়াছে, সেই খাল দিয়া গঙ্গার অর্দ্ধেক জল আইসে। এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের উচ্চতর অঞ্চলের কৃষকেরা সেই জল ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া কৃষিকার্য্য করে। এই খাল আবার কানপুরে আসিয়া গঙ্গার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। নিম্ন গঙ্গার খাল প্রথমোক্ত খাল হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণমুখে গিয়াছে। তথাপি এই খালের জল রাজঘাটের নিকট দিয়া গঙ্গা হইতে আইসে। দোয়াব অঞ্চলের নিম্নভাগে এই খাল দিয়া জল যায়। দুইটী খালের প্রধান খাল ৫০০ ক্রোশ দীর্ঘ, তদ্ব্যতীত ২২০০ শত ক্রোশ শাখা খাল আছে। এই খালের জলের সাহায্যে প্রতি বৎসর চারি কোটি টাকা মূল্যের শস্য জন্মে। যে জমিতে খালের জল যায় না, সে জমি মরুভূমিবৎ। কিন্তু যে জমিতে খালের জল যায়, সে জমিতে সোনা ফলে। কৃষি কার্য্যের ভূমিতে জল সেচনার্থ এমন খালখননকার্য্য পৃথিবীর আর কোন দেশে হয় নাই। প্রধান খাল দিয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে নৌকার চলাচলও হইয়া থাকে।

হরিদ্বারের একটু ভাটিতেই রুরকি নামক স্থান। এখানে একটী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও খাল সম্বন্ধীয় প্রকাণ্ড এক কারখানা আছে।

হরিদ্বার বিখ্যাত তীর্থ স্থান। পর্ব্বতাবাস হইতে এই স্থান দিয়া গঙ্গা বাহির হইয়াছে। হরিদ্বার অর্থে "বিষ্ণুর দ্বার," কিন্তু শিবভক্তেরা বলেন যে, প্রকৃত নাম "হরদ্বার।" শৈব ও বৈষ্ণব মতের বর্ত্তমান আকার-প্রাপ্তির বহুকাল পূর্ব্ব হইতে যে হরিদ্বার মহাতীর্থরূপে গণ্য, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

গঙ্গাদ্বারের মন্দির ও ঘাট অতি রমণীয়। ঘাটের উপরকার প্রাচীরে এক খানি পাথর আছে। তাহাতে বিষ্ণুপদাঙ্ক আছে বলিয়া লোকে তাহার বড় মান্য করিয়া থাকে। বহুসংখ্যক যাত্রী এখানে সমবেত হয়। সকলের ইচ্ছা, স্নানের নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইলে সকলের অগ্রে কুণ্ডে গিয়া পড়ে। ইহাতে অত্যন্ত হড়াহুড়ি ও গণ্ডগোল হয়। ১৮১৯ সালে যাত্রী ও পাহারার সিপাহি সমেত ৪৩০ জন লোক উক্ত রূপে হড়াহুড়ি করিয়া মরিয়া যাওয়াতে, গবর্ণমেণ্ট ৬৬ হাত চৌড়া নূতন ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে ৬০ টী ধাপ আছে। বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে গঙ্গা ভূতলে পদার্পণ করেন বলিয়া, ঐ তারিখে স্নান করণার্থ বহু যাত্রির সমাগম হয়। দ্বাদশ বৎসর অন্তর এক বার কুম্ভ নামে মহামেলা হয়। তাহাতে ভারতের সর্ব্ব দেশ হইতে অযুত অযুত লোক হরিদ্বারে যায়।

## গঙ্গা।

গঙ্গার সাগরসঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া উৎপত্তি স্থান হরিদ্বার পর্য্যন্ত উভয় তীরবর্ত্তী নগর সকলের যথাসাধ্য বর্ণন করিলাম। কিন্তু ইহার প্রকৃত উৎপত্তিস্থান আরও উচ্চ হিমালয়ের অভ্যন্তরে। গঙ্গোত্তোরণী মন্দিরের আরও উর্দ্ধে, একটী চিরনিহারমণ্ডিত স্থানের নিম্নস্থ একটী বরফের গুহা হইতে গঙ্গা ভাগীরথী নামে বাহির হয়। মন্দির হইতে ৪ ক্রোশ উর্দ্ধে এই গুহা। পবিত্রা নদীর উৎপত্তি স্থান বলিয়া যাত্রিরা সেখানেও গিয়া থাকে। গঙ্গোত্তোরণীতে পাণ্ডারা মাটীর ছোট ছোট ভাণ্ডে গঙ্গা জল পূরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া বিক্রয় করে, লোকে অমূল্য নিধি জ্ঞানে তাহা বহুযত্নে দেশে লইয়া যায়।
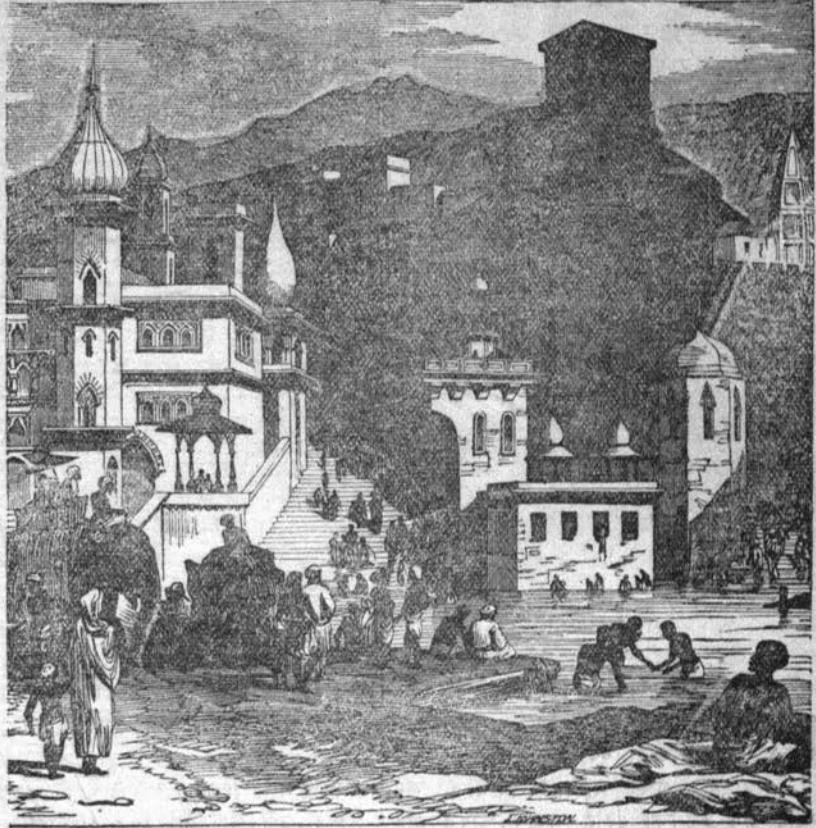
হরিদ্বারের ঘাট।

গঙ্গার উৎপত্তি স্থান সমুদ্র হইতে ৯২৪ হাত উচ্চ। হরিদ্বার ৬৮৪ হাত উচ্চ, তার পরে ক্রমেই নিম্ন হইয়া গিয়াছে। বারাণসীতে গঙ্গা সমুদ্র হইতে ২৩২ হাত উচ্চ। উৎপত্তি স্থান হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত গঙ্গা ৭৮০ ক্রোশ দীর্ঘ। ইহাতে অনেক নদী আসিয়া পড়িয়াছে। আমেরিকার আমেজন নদীর দৈর্ঘ্য ২,০০০ ক্রোশ।

সকল দেশেই মূর্খ লোকেরা আপনাদের সৃষ্টিকর্ত্তার আরাধনা না করিয়া, যে সকল সৃষ্ট বিষয় তাহাদের উপকারী, তাহারই পূজা করে। ভারতবর্ষে গঙ্গা নদীর দ্বারা জনসাধারণের যার পর নাই উপকার হয়। কিন্তু মিসর দেশের পক্ষে নীল নদী আরো উপকারী, এই নদী না থাকিলে সমস্ত দেশ মরুভূমি হইয়া যায়। সে কালের মিসর দেশীয় লোকেরা এই নদীর এক দেবতা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিত। আকাশে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, হিন্দুরা সে সকলেরই পূজা করিয়া থাকে; সূত্রধর আপন যন্ত্রের এবং স্ত্রীলোকে হাঁড়ী কলসীর পূজা করে। অতএব গঙ্গা যে হিন্দু জাতির উপাস্য বস্তর মধ্যে প্রধান, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

বেদে দুই বার মাত্র গঙ্গার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক সময়ে আর্য্যগণ ভারতবর্ষের বহু দূর প্রবেশ করেন নাই, সুতরাং বেদে সিন্ধু নদীরাজরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

রামায়ণে, পরে মহাভারতে গঙ্গাসম্বন্ধীয় আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিবরণ দেখিতে পাই, পুরাণে সেই সকলের অনেক ডাল-পালা বাহির হইয়াছে। প্রথমে গঙ্গা দেবী হিমালয়ের কন্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পুরাণ মতে বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবী গঙ্গার বেগ ধারণ করিতে অসমর্থা বলিয়া মহাদেব গঙ্গাকে আপন জটায় ধারণ করেন।

গঙ্গা-তীরস্থ মন্দির।

গঙ্গায় স্নান করিলে, বিশেষতঃ যোগের সময়ে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। গঙ্গার তীরে মরিলে এবং সৎকার প্রাপ্ত হইলে নিশ্চয় স্বর্গলাভ হয়। শত শত যোজন দূরে থাকিয়া গঙ্গা নাম জপ করিলে তিন জন্মের পাপ মার্জ্জনা হয়।

গঙ্গাতে দেবত্বের আরোপ ভ্রম মাত্র। অন্যান্য নদীর ন্যায় হিমালয় পর্ব্বতে ইহার উৎপত্তি; ইহার জলও অন্য নদীর জল অপেক্ষা কোন অংশে পবিত্র নহে! গঙ্গার সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের আরাধনা না করিয়া যাহারা গঙ্গার আরাধনা করে, পাপমোচন হওয়া দূরে থাকুক, ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করাতে তাহাদের অপরাধ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে॥

## হিমালয় পর্ব্বত।

হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ, এস্থলে এই পর্ব্বতমালার কিছু বিবরণ দেওয়া বিহিত।

হিমালয় পর্ব্বত ভারতবর্ষের উত্তর সীমানা, সিন্ধু নদ হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত ৭৫০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ১০০ ক্রোশ প্রস্থ।

গঙ্গা ও সিন্ধু নদের নিম্ন তলভূমি হইতে দক্ষিণ দিকের পাহাড়তলি আরম্ভ হইয়াছে; উত্তর সীমানা তিব্বৎ দেশের অধিত্যকা ভূমি—সমুদ্র হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ উচ্চ।

সমভূমি হইতে দৃষ্টি করিলে দূরবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী সাদা মেঘ-মালার ন্যায় বোধ হয়। পর্ব্বত গুলি মেঘের ন্যায় দেখায়, কিম্বা পর্ব্বতের চূড়াস্থিত প্রকৃত মেঘমালাই দূর হইতে দৃষ্ট হয়, অনেক সময়ে স্থির করা কঠিন। যত নিকটে যাওয়া যায়, বৃক্ষলতায় আচ্ছাদিত নিম্নতর পর্ব্বতগুলি ততই বড় দেখায়, এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী উচ্চতর পর্ব্বতমালা আর চক্ষে পড়ে না।

হিমালয়ের পর্ব্বতমালার পাদদেশে দশ ক্রোশ প্রস্থ সমভূমি আছে, তাহাকে তেরাই বলে। পর্ব্বত চুয়াঁইয়া সর্ব্বদা জল আসাতে তেরাই ভূমি সর্ব্বদা ভিজা থাকে, তাহাতে সূর্য্যের কিরণ পড়াতে অত্যন্ত ঘন জঙ্গল হইয়াছে। এই তেরাই অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, এবং বন্য পশুতে পরিপূর্ণ। তেরাই ভূমির পরেই ২০০০
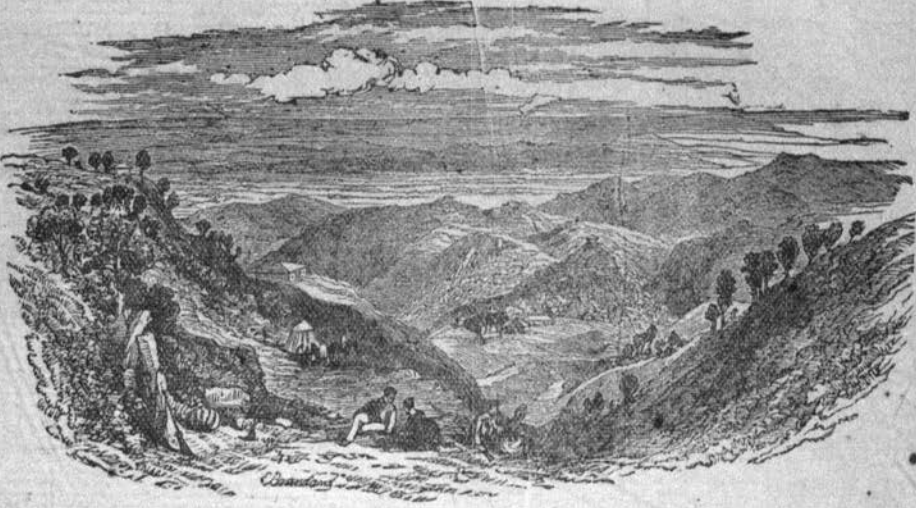
হিমালয়ের নিম্নদেশ।

হাত উচ্চ এক পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তাহা শালবনে পরিপূর্ণ। তাহার পরেই মধ্যে মধ্যে জলসিক্ত উপত্যকা ভূমি, তাহাকে দূন বলে, — এই দূন প্রকৃত পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই উপত্যকা ভূমি পর্ব্বতের জলে সিক্ত হয়। ইহাতে বিস্তর ধানের চাষ হয়, এক্ষণে বিস্তর চা বাগান হইয়াছে।

অনন্তর আর এক পর্ব্বতশ্রেণী উঠিয়াছে, ইহার উচ্চতা ৫৪০০ হাত। ইহাতে নানাজাতীয় বৃক্ষলতা জন্মে। এই পর্ব্বত শ্রেণীর উপরে দারজিলিং, নাইনিতাল এবং সিমলা প্রভৃতি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে অনেকে ঐ সকল স্থানে গিয়া বাস করে।

আরও উপরে উঠিলে শাল জাতীয় বৃক্ষ আর দেখিতে পাওয়া যায় না, এখানকার বৃক্ষ লতা ঠিক বিলাতী। কেলু বৃক্ষের বন দেখিতে পাওয়া যায়; আঙ্গুর ও বিলাতী জাম জাতীয় নানা ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

যে জমীতে যথেষ্ট জল পড়ে, সেখানে ধান্য জন্মিয়া থাকে। ৮,০০০ হাত উচ্চ পর্ব্বতের কোন কোন স্থানে যবের চাষও হইতে পারে। পর্ব্বত যতই উচ্চ, বৃক্ষগুলি ততই ছোট হইয়াছে, অবশেষে ১০০৫০ হাত উচ্চে উঠিলে তৃণ লতাও দেখিতে পাওয়া যায় না; কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর চিরনিহারে আবৃত।

৭,৪০০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ পর্ব্বতে বাঘ ও বানর, ৮,৩০০ হাত পর্য্যন্ত চিতা বাঘ, ও আরও উচ্চে ভল্লুক দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে বহুসংখ্যক ছাগ ও মেষ পুষিয়া থাকে; ইহাদের মাংস লোকের আহার, লোম দ্বারা কাপড় হয়, আবার ছাগ ও মেষেরা পৃষ্ঠে করিয়া বোঝা লইয়া গিরিসঙ্কট দিয়া যাতায়াত করে। তিব্বতে যাক নামক এক প্রকার পশু আছে, সেগুলি কতকটা আমাদের মহিষের মতন। কিন্তু তাহাদের লোম লম্বা। এই পশু তিব্বতীয়দিগের অনেক কাজে লাগে।

দুই পর্ব্বতের মধ্য দিয়া যে গলির মতন পথ ক্রমে উর্দ্ধে উঠিয়াছে, তাহাকে পাস্ বা গিরিসঙ্কট বলে। সর্ব্বোচ্চ গিরিসঙ্কট সমুদ্র হইতে ১৩,৪০০ হাত উচ্চ। যথার্থই গিরিসঙ্কট বটে, অধিকাংশ গিরিসঙ্কট অতি ভয়ঙ্কর পথ, পর্ব্বতের ঝর্ণার পাশ দিয়া গিয়াছে, তাহা ফেণাময়, আবার এই ফেণাময় স্রোত অনেক স্থানে অন্ধকারপূর্ণ গুহার ভিতর দিয়া গিয়াছে। ইহার দুই ধারে আইলের ন্যায় পর্ব্বত যেন মেঘমালা ভেদ করিয়া আকাশপথে উঠিয়াছে। এই গগনভেদী পর্ব্বতের চূড়া হইতে প্রস্তরখণ্ড সকল অনবরত বর্ষণ হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে বড় বড় পাথর খসিয়া পড়িয়া স্তূপাকার হয়, নিম্নে যে পথ হইয়াছিল, সে সকল বন্ধ করিয়া ফেলে। আবার নদীর গর্ভ ভরিয়া যাওয়াতে নদীসঙ্কট ঘটে। কখন কখন পর্ব্বতের এক পাশ ভাঙ্গিয়া, নিম্নে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বড় বড় বৃক্ষ সমূলে ভগ্ন পর্ব্বতের সঙ্গে নিম্নভাগের খড়ে পড়িয়া যায়, মূলগুলি উপর দিকে আর ডাল-পালা নিম্নদিকে থাকে।

এই পর্ব্বতমালায় আরোহণ করিতে করিতে সর্ব্বাঙ্গ যেন ঝিম ঝিম করিতে থাকে। ইহার কারণ এই যে বাতাস অত্যন্ত লঘু, শ্বাস গ্রহণ করিয়া জীবন যেন রক্ষা করা কঠিন বোধ হয়। অল্প পরিশ্রম হইলেই অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হয়, এবং দু চারি পা চলিলেই বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করে।

দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, পর্ব্বতগুলি যেন পরস্পর সংলগ্ন। ফলে কিন্তু তাহা নয়; দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থলে
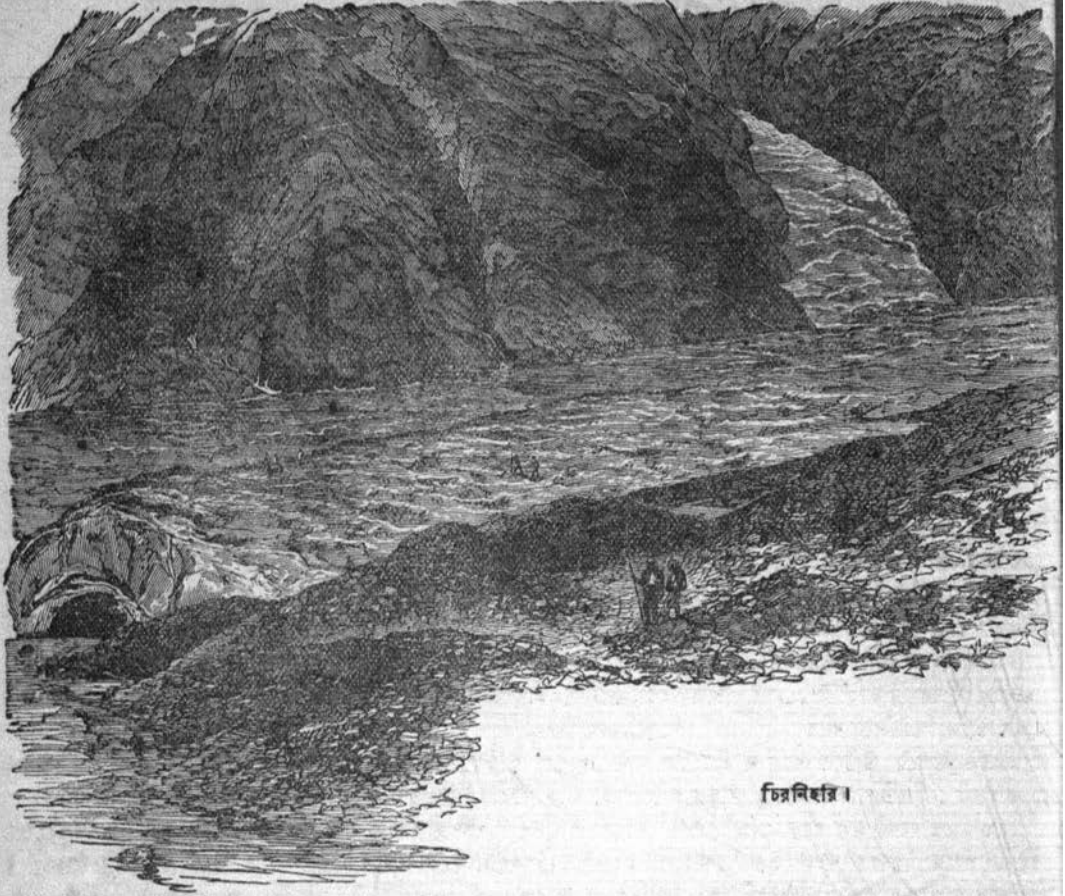
চিরনিহার।

খড আছে। এই খড দিয়া নদী নামিয়া আইসে, এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে অতি বেগে ধায়। বরফের বড় বড় চাপ (এক একটা চাপ দশ পনের বিঘা হইবে) পর্ব্বতের গা বহিয়া খড়ে পড়ে।

পর্ব্বতগুলির গড় উচ্চতা ১২,০০০ হাজার হাত, কিন্তু ৪৮টী গিরি ১৬,০০০ হাজার হাতেরও অধিক উচ্চ। এবারেষ্ট, বা চিরনিহার নামক পর্ব্বত নেপালের উত্তর সীমানায় স্থিত, এটীর উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট (প্রায় ২০ হাজার হাত) পৃথিবীতে যত পর্ব্বত আছে, তন্মধ্যে এইটী সর্ব্বোচ্চ। ইহার খাড়াই আড়াই ক্রোশের অধিক। নেপালের পূর্ব্ব সীমানায় কাঞ্চনজঙ্ঘ নামে এক পর্ব্বত আছে, ইহার উচ্চতা ২৮,১৬০ ফুট (প্রায় ১৮,৮০০ হাত), উচ্চতায় পৃথিবী মধ্যে এইটী দ্বিতীয়। দার্জ্জিলিং হইতে এই পর্ব্বতের দৃশ্য যেরূপ দেখা যায়, তাহার চিত্র দিলাম।

ধবলাগিরি বারাণসীর উত্তরে, ইহার উচ্চতা ২৬,৮২৬ ফুট, (১৮ হাজার হাত) যমুনোত্তোরণীশিখর ২১,১৫৫ ফুট উচ্চ (প্রায় ১৪ হাজার হাত) এই পর্ব্বতে যমুনার জন্মস্থান।

এই পর্ব্বতমালার দক্ষিণ পার্শ্বের চিরনিহার শ্রেণী ১৬,০০০ (১০৬০০ হাত) ও উত্তর পার্শ্বে চিরনিহারশ্রেণী ১৭,৪০০০ হাজার ফুট (১১৬০০ হাত) উচ্চ। দক্ষিণ পার্শ্বে সূর্য্যের রশ্মি লাগে বলিয়া এই ভিন্নতা ঘটিয়াছে।

হিমালয় পর্ব্বত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন নহে। কিরূপে জানা গেল? সমুদ্র হইতে প্রায় ১০ হাজার হাত উচ্চে উক্ত পাহাড়ের গায়ে শামূক ইত্যাদির খোলা পাওয়া যায়, সেগুলি অধিক দিনের নহে। এই সকল পাহাড়, তাহা হইলে, এক সময়ে জলের নীচে ছিল। নীচে তরল গ্রেনাইট নামে পদার্থ থাকাতে তাহার জোরে পাহাড় এত উচ্চে উঠিয়াছে। ভূমিকম্পের দ্বারা অনেক স্থল ফাটিয়া যাওয়াতে তাহা দিয়া গলিত বা তরলীকৃত গ্রেনাইট প্রবিষ্ট হয়। এই প্রকার ফাটা পাহাড় অনেক আছে। অত্যন্ত উত্তাপে পাথর কঠিনতর হইয়া যায়। যমুনোত্তোরণী পাহাড়ের নিকটে উষ্ণপ্রস্রবণ আছে।

হিমালয়ের একটী দৃশ্য অতি চমৎকার,—পর্ব্বতশিখরের নিম্নভাগে চারি দিকে মেঘ জমিয়া রহিয়াছে, পর্ব্বতের চূড়াটী ঠিক দ্বীপের ন্যায় দেখায়। অনেক সময়ে নীচে বিদ্যুৎ চমকায়, কিন্তু চূড়াদেশ পরিষ্কার।

সূর্য্যাস্তকালে পর্ব্বতমালার যে বর্ণপরিবর্ত্ত হয়, দূর হইতে তাহা দেখিতে অতি সুন্দর। এক জন ভ্রমণকারী এইরূপে তাহার বর্ণন করিয়াছেন। চারি দিকের পাহাড় গুলিতে যেন আগুন লাগিয়াছে, তাহার পরে রংটী গাড় ভায়োলেট হইল, এবং পরে বরফের উপরকার রং যখন গলিয়া প্রথমে গোলাপী, পরে পাটথিলের বর্ণ ধারণ করিল, তখন নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল, অবশেষে আর কিছুই রহিল না। একটী মাত্র অগ্নিশিখা সর্ব্বোচ্চ বরফমণ্ডিত পর্ব্বতশিখরে খানিকক্ষণ থাকিয়া, শেষে সেটীও নিবিয়া গেল।

হিমালয় পর্ব্বতমালা দ্বারা ভারতবর্ষের যার পর নাই উপকার হইয়া থাকে। সমুদ্রের জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠে, এবং শিশির, নিহার, বা বৃষ্টি হইয়া হিমালয় পর্ব্বতমালার উপরে পতিত হয়, সূর্য্যের উত্তাপে বরফ গলিয়া জল হয়, সেই জল শত সহস্র নির্ঝর দিয়া সমভূমিতে আসিয়া পড়াতে, বৎসরের যে সময়ে অত্যন্ত গ্রীষ্ম, সেই সময়ে নদী সকল প্লাবিত হয়। তাহাতে ভূমি রস গ্রহণ করাতে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়,—আবার তাহাতে উত্তরে ঠাণ্ডা বাতাসও বহিতে পারে না।

অনেক দেশেরই মূর্খ ও অজ্ঞান লোকদিগের বিশ্বাস এই যে, দুর্গম উচ্চ পর্ব্বতে দেবতারা বাস করেন। গ্রিস্ দেশের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের নাম অলিম্প; গ্রিকেরা ভাবিত, এই পর্ব্বত কেবল দেবতাদের বাসস্থান। পুরাণ মতে হিমালয় পর্ব্বত কল্পিত সুমেরু পর্ব্বতের দক্ষিণে, এবং শিবের বাসস্থান রজতময় কৈলাস পর্ব্বত উহার পশ্চিমে। হিমালয় পর্ব্বতে কতকগুলি কল্পিত পুণ্য স্থান আছে, অনেক যাত্রী অনর্থক কষ্ট স্বীকার করতঃ সেই সকল তীর্থ স্থানে বিশেষ২ দেবতার আরাধনা করণার্থ যাইয়া থাকে। "যিনি পরাৎপর, তিনি হস্তকৃত মন্দিরে বাস করেন না।" (প্রেঃ ৭; ১৮) ঈশ্বরের আরাধনা করণার্থ বহুদূর তীর্থ স্থানে যাইবার প্রয়োজন নাই। "তিনি আমাদের হইতে দূরে আছেন তাহা নহে। তাঁহাতেই আমাদের জীবন ও গতি ও সত্তা হইতেছে।" (প্রে ১৭; ২৪।) যখনই যেখানে থাকি না কেন, তিনি সততই আমাদের স্তব স্তুতি শুনিতে প্রস্তুত।

যমুনার তীরবর্ত্তী নগর সমূহ। আলাহাবাদ বা প্রয়াগে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থানের অনতিদূরে যমুনার উপর দিয়া অতি চমৎকার একটী রেলওয়ে পুল হইয়াছে। এক্ষণে, এই খান হইতে যমুনা উজাইয়া উহার তীরবর্ত্তী নগরসমূহের বর্ণন করিব।

## আগরা।

আলাহাবাদ হইতে রেলপথে আগ্রা ১৪০ ক্রোশ, কিন্তু যমুনার বাঁক ঘুরিয়া যাইতে গেলে ঢের দূর। যমুনার একটী বাঁকের সমস্তটা ঘুড়িয়া এই নগর। যমুনা এইখানে আসিতে আসিতে হঠাৎ পূর্ব্ববাহিনী হওয়াতে এই বাঁক হইয়াছে। বাঁকের ঠুঁটার মুখে নদীর গায়েই দুর্গ। স্থানটী প্রায় সর্ব্বত্রই সমতল, কেবল মধ্যে মধ্যে গর্ত্ত, খানা আছে, নগরটী পশ্চিম তীরে।

ইতিহাস।—আকবর বাদশাহের পূর্ব্বে লুদিবংশীয় রাজারা আগ্রায় বাস করিতেন। কিন্তু যমুনার পূর্ব্ব তীরে তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। ১৫২৬ সালে মহম্মদ বাবর উক্ত নগরের পুরাতন রাজবাটী দখল করতঃ স্থায়ীরূপে বাস করেন। ১৫৩০ সালে এই খানে তাঁহার মৃত্যু হইলে, দেহটী কাবুলে নীত হয়। তৎপুত্র হুমায়ুন আগ্রাতে বাস করেন। হুমায়ুনের পুত্র আকবর যমুনার পশ্চিম তীরে বর্ত্তমান আগ্রা নগর স্থাপন করতঃ এই স্থানে থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১৫৬৬ সালে আকবর দুর্গনির্ম্মাণ এবং রাজবাটী সকলের নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। আকবরের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র জাহাঙ্গির সিংহাসনপ্রাপ্ত হয়েন এবং সিকন্দ্রাবাদে পিতার সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। আগ্রায় যত উৎকৃষ্ট বাটী দেখ, সে সকল জাহাঙ্গিরের পুত্র সাজিহান নির্ম্মাণ করেন। সাজিহানের চতুর্থ পুত্র আরঙ্গজিব রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া দিল্লী নগরে রাজধানী লইয়া যান। তৎপরে আগ্রার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই নগর দখল করে। ১৮০৩ সালে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেক্ তাহাদিগকে পরাজিত করতঃ নগরটী হস্তগত করেন। ১৮৩৫ সালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী আলাহাবাদ হইতে আগ্রায় লইয়া যাওয়া হয়, কিন্তু ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর পুনরায় আলাহাবাদেই রাজধানী হইয়াছে।

বিশেষ বিশেষ বাটী।—রক্তবর্ণ বেলে পাথর দ্বারা দুর্গটী নির্ম্মিত। ইহার প্রাচীর ২৬ হাত উচ্চ। ইহার অভ্যন্তরে মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের বাসোপযোগী নানা অট্টালিকা আছে। দুইটী বড় বড় দালান বা হল আছে; একটীতে প্রকাশ্য দরবার হইত, আর একটীতে বাদশাহেরা অমাত্যগণ লইয়া দরবার করিতেন,
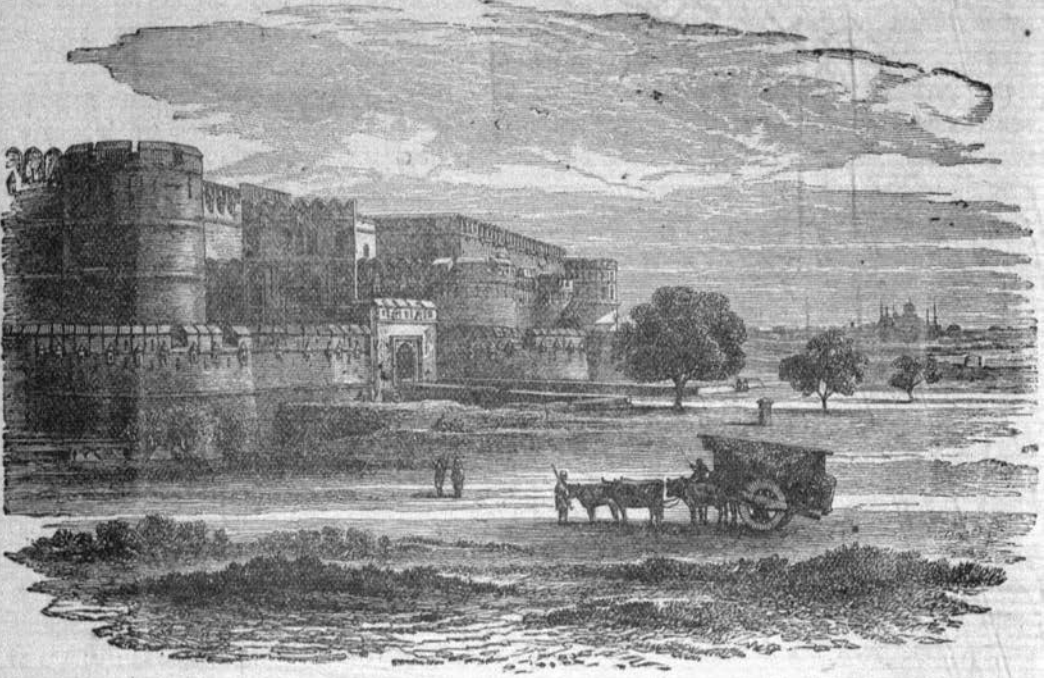
আগরা সহরের কেল্লা।

ইহাতে শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত কুঠরী আছে। কারুকার্য্যময় স্তম্ভের উপরে সুন্দর ছত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। ছাতের পারাপিট শ্বেত-প্রস্তরনির্ম্মিত, তাহাতে নানা কারুকার্য্য। তম্মধ্য দিয়া যমুনা ও চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী পল্লীসমূহের দৃশ্য দৃষ্ট হয়। আয়না-মহল স্নানাগার, তাহার দেওয়ালে শত সহস্র ছোট বড় আর্শী গাঁথা রহিয়াছে।

১৬৫৪ শালে শাজিহান মতি মসৃজিদ নির্ম্মাণ করেন। বেলে পাথরের সমতল ভিতের উপরে ইহা স্থাপিত; ইহার তিনটী গম্বুজ সাদা মারবেল পাথরে নির্ম্মিত, চূড়া গিল্টি করা। তাজমহল নামক মসজিদই সর্ব্বপ্রধান। ইহাতে সাজিহান ও তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর সমাধি হইয়াছে। এমন সুন্দর মসৃজিদ ভারতবর্ষে আর নাই। মুসলমান বাদশাহেরা প্রায় সকলেই জীবিতকালে আপনাদের সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করাইতেন। নির্ম্মাণ-কার্য্যের তত্ত্বাবধান নিজেরাই করিতেন। সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে হইলে, বাদশা প্রথমে একটী বাগান পচন্দ করিতেন, তাহার চারি দিকে উচ্চ প্রাচীর দিয়া মধ্যস্থলে এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইতেন। বাদশা যত দিন জীবিত থাকিতেন, তত দিন স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব লইয়া বৈকাল বেলা এই খানে শীতল বায়ু সেবন করিতেন, মৃত্যু হইলে তাঁহার দেহ এই খানে আনিয়া কবর দেওয়া হইত।

এই সকল সমাধি মন্দিরের গঠন প্রায়ই এক রূপ, চারি দিকে উচ্চ প্রাচীর, একটী কি দুইটী প্রবেশদ্বার। মধ্যস্থলে উচ্চ বেদি। এই বেদিও চতুষ্কোণ, শেষে কোণগুলি কাটিয়া তাহার উপরে গম্বুজ স্থাপিত। কোন কোন মন্দিরের চারি কোণে চারিটী উচ্চ স্তম্ভ আছে। উক্ত স্তম্ভের মাথায়ও ছোট ছোট গম্বুজ। মধ্যস্থলে একটী পাথরের সিন্দুকের মধ্যে শব থাকে। উপরতলায় একটী খালি সমাধি আছে। মৃত স্ত্রী ও আত্মীয়-গণের দেহ কোণস্থ কক্ষে বা অন্যান্য কক্ষে কবর দেওয়া হয়। "মম তাজমহল" শাজিহানের প্রিয়তমা ভার্য্যার উপাধি। ১৬২৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাজমহলের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ ও ১৬৪৮ সালে শেষ হয়। ফতেপুর শিক্রির লাল বেলে পাথর ও জয়পুরের শ্বেত প্রস্তর দ্বারা মন্দিরটী নির্ম্মিত। ইহাতে দুই কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

আগ্রা হইতে এক ক্রোশ দূরে যমুনার তটে এই মন্দির স্থাপিত। ইহার প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বার অতি প্রকাণ্ড। সম্মুখে মনোহর উদ্যান, নানাজাতি বৃক্ষাবলীর হরিদ্বর্ণ ও ছায়া অতি স্নিগ্ধকর। মধ্যে মধ্যে জলের ফোয়ারা। আবার মন্দিরের দিকে যাইবার যে পথ আছে, তাহার দুই পার্শ্বে শোকপ্রকাশক সাইপ্রস বৃক্ষশ্রেণী। এই

যমুনার দৃশ্য।

সাদা পাথরের পরদা।

পথ দিয়া মন্দিরের দিকে যাওয়া যায়। সমাধি মন্দিরটী এক ডবল চাতালের উপর স্থাপিত। প্রথম চাতাল বেলে পাথরে নির্ম্মিত ও ২০ ফুট উচ্চ, এবং পরিধি ১০০০ ফুট। দ্বিতীয় মারবেল পাথরের, ১৫ ফুট উচ্চ, এবং ৩০০ শত ফুট বেড়।

লণ্ডনের "টাইম" নামক দৈনিক সংবাদ পত্রের সংবাদ দাতা রসেল সাহেবের বর্ণনা হইতে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করা গেল।—
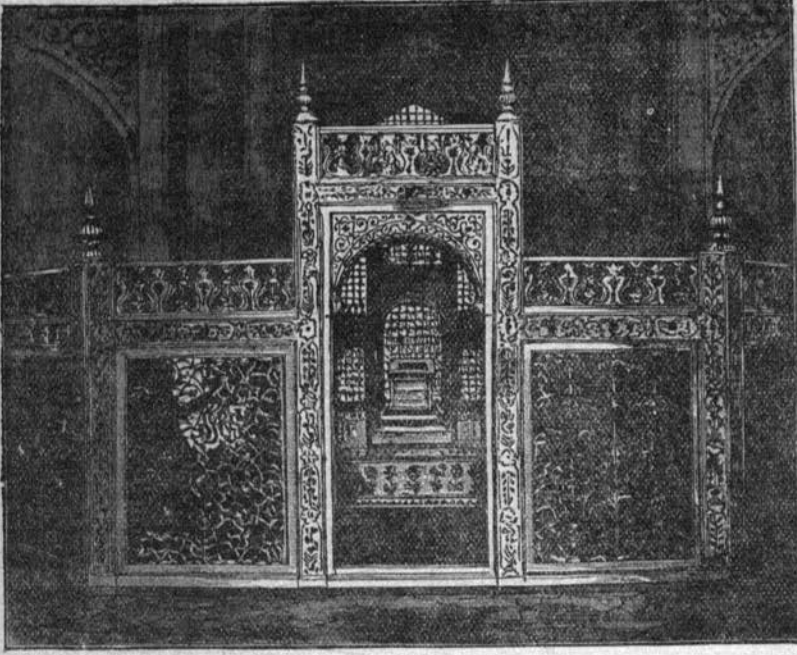
"যে মারবেল চাতালের উপরে, গম্বুজ ও চূড়াসম্বলিত তাজমহল স্থাপিত, তাহার উপরে উঠিয়া দৃষ্টি করিলে, বাটীটীর সর্ব্বাবয়ব সমষ্টির সৌন্দর্য্যে মন এমন সন্তুষ্ট হয় যে, তন্ন তন্ন করিয়া সর্ব্বাংশ দেখিবার ইচ্ছা মনে উদয় হইবার অবকাশ থাকে না। জানালাস্থিত কারুকার্য্য যুক্ত মারবেলের পরদা, কারুকার্য্যসম্বলিত বারাণ্ডার ছাদ, খিলানের প্রবেশ দ্বার, বহুমূল্য প্রস্তর দ্বারা দেওয়ালে অঙ্কিত নানাজাতি ও নানাবর্ণের পুষ্পমালা, (বোধ হয় যেন এখনিই বাগান হইতে ফুল তুলিয়া আনিয়া, মালা গাঁথিয়া মারবেলের উপরে বসাইয়া দিয়াছে।) অতি মনোহর। ভিতরে প্রবেশ করিলে, গম্বুজের উচ্চ খিলান তোমার মাথার উপরে, মধ্যস্থলে সমাধি, ইহাও শ্বেতপ্রস্তরের। ঐ শুন এক জন শ্বেত শ্মশ্রুবিশিষ্ট মৌলবী অবনত মস্তকে কোরাণ পাঠ করিতেছেন। সেই পাঠের স্বর ঊর্দ্ধ দিকে উঠিয়া বহুজনের স্বরবিশিষ্ট হইতেছে, যেন আকাশবিহারী বহুলোকারণ্য একসঙ্গে গান গাহিতেছে।

মধ্যস্থলেই সমাধি, তাহার উপরেই ছত্রের ন্যায় ধবল প্রস্তরনির্ম্মিত গম্বুজ, চাতাল হইতে ২০০ শত ফুট উচ্চ, মূলদেশের বেড় ২০০ ফুটের অধিক। উপরে দুইটী গিল্টি করা গোলোক, তাহার উপরে চূড়া। মসজিদের প্রতি কোণে একটী করিয়া ছোট গম্বুজ। চারি দিক দিয়াই সমাধির দিকে যাওয়ার পথ আছে। যে গুলিতে খিলান, অতি সুন্দর খিলান। এই শ্বেত প্রস্তরের উপর কোরাণের বচন ও ফুলের মালা ইত্যাদি নানাবর্ণের বহুমূল্য প্রস্তর দ্বারা রচিত। মসজিদের নিম্নভাগে গম্বুজের নীচে সাজাহান ও তাঁহার পত্নীর সমাধি। তাজবিবির কফিনের উপরে অতি কারুকার্য্য সহকারে কোরাণের বচন অঙ্কিত রহিয়াছে। সাজাহানের সমাধির উপরে যে গম্বুজ আছে, তাহা আরও উচ্চ। এই দুইটী সমাধির চতুর্দ্দিকে মারবেল পাথরের অতি অপূর্ব্ব কারুকার্য্যযুক্ত পরদা। সমাধিতে একটী আলো জ্বলিতেছে, কফিনের উপরে ফুলের মালা। যে কক্ষমধ্যে সমাধি স্থাপিত, তাহা অষ্টকোণ বিশিষ্ট অন্ধকারময়। কিন্তু এই আলোকের জ্যোতি সমাধি মন্দিরের মণিময় দেওয়ালে পড়িয়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—আলো ঘোর অথচ উজ্জ্বল। উপরে বড় দালানের মধ্যে সাজাহান ও তৎপত্নীর শূন্য কফিন রহিয়াছে। তাহার উপরে যে কত প্রকারের কারুকার্য্য, বলিয়া বুঝাইতে পারি না। কফিনে, দেওয়ালে, খিলানে, সর্ব্বত্র নানাবর্ণের বহুমূল্য প্রস্তরে রচিত ফুলের মালা ও কোরাণের বচন ইত্যাদি এত রহিয়াছে যে, তাহা বর্ণনাতীত।

বাণিজ্য ইত্যাদি,—আগরা নগরের সহিত কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন রেলপথের সংযোগ আছে। যমুনার উপর দিয়া একটী সেতু আছে, তাহার উপর দিয়া তুন্দলা ষ্টেসন পর্য্যন্ত ৭ ক্রোশ দীর্ঘ একটী রেলপথ আছে।

আকবরের অট্টালিকা।

তাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। আগরার নির্ম্মিত মারবেল পাথরের নানাপ্রকার জিনিষ অতি বিখ্যাত।

নিকটবর্ত্তী অট্টালিকা সকল।—আগরা হইতে ৩ ক্রোশ দূরে সিকন্দ্রাবাগ। এই স্থানে আকবরের সমাধি মন্দির, এই মন্দির আকবর নিজে নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার পুত্রদের সময়ে নির্ম্মাণ কার্য্যের শেষ হয়। একটী প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যস্থলে এই সমাধি মন্দির, বাগানের চারি দিকে উচ্চ প্রাচীর, বাগানের ভূমিপরিমাণ সিকি মাইল। মন্দিরটীর বেড় ২০০ হাত ও উচ্চতা ৬৭ হাত। উপরে নানাপ্রকার গম্বুজ ও চূড়া ইত্যাদি। এই মন্দিরের মধ্যে সম্রাটের দেহ সমাহিত রহিয়াছে। উপর তলায় খালি কফিন, তাহা একখানি অখণ্ড মারবেল প্রস্তরে নির্ম্মিত।

মোগল সম্রাটগণের মধ্যে আকবরের তুল্য আর কেহ ছিল না। তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেন না, এবং হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে যে ভিন্নভাব ছিল, তাহা দূর করণার্থ বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি জিজিয়া নামক কর উঠাইয়া দেন, ও আরও অনেক সাধারণের হিতকর কার্য্য করেন।

ফতেপুর সিকরী।—এই স্থান আগরা হইতে ১২ ক্রোশ পশ্চিমে। এইখানে রাজধানী স্থাপন মানসে আকবর কয়েকটী উচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। ইহার চারি দিকে আড়াই ক্রোশ স্থান লইয়া প্রস্তরনির্ম্মিত এক উচ্চ প্রাচীর আছে। এই প্রাচীরের মধ্যে সে কালের বাটী সকলের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। এই স্থানের মসজিদটী অতি উৎকৃষ্ট। মসজিদের মধ্যে এক ফকীরের সমাধিস্তম্ভ। কথিত আছে, এই ফকীরের আশীর্ব্বাদে আকবর একটী পুত্রলাভ করেন। সন্তানকামনায় এখনও স্ত্রীলোকেরা এই মসজিদে গিয়া উক্ত পীরের দরগায় সিন্নি চড়ায়। একটী অট্টালিকার নাম লুকোচুরী; কথিত আছে, এখানে সম্রাটের মহিষীরা আমোদ প্রমোদ করিতেন। কিরণ মিনার নামে ৪৭ হাত উচ্চ একটী স্তম্ভ আছে, ইহার বহির্ভাগ দেখিলে বোধ হয়, ইহা হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত, ফলে কিন্তু তাহা নয়।

যমুনার নিকটবর্ত্তী হওয়াতে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাওয়ার অনেক সুবিধা আছে। ৫০ বৎসর পরে ফতেপুর সিকরি পরিত্যক্ত ও দিল্লীতে রাজধানী স্থাপিত হয়।
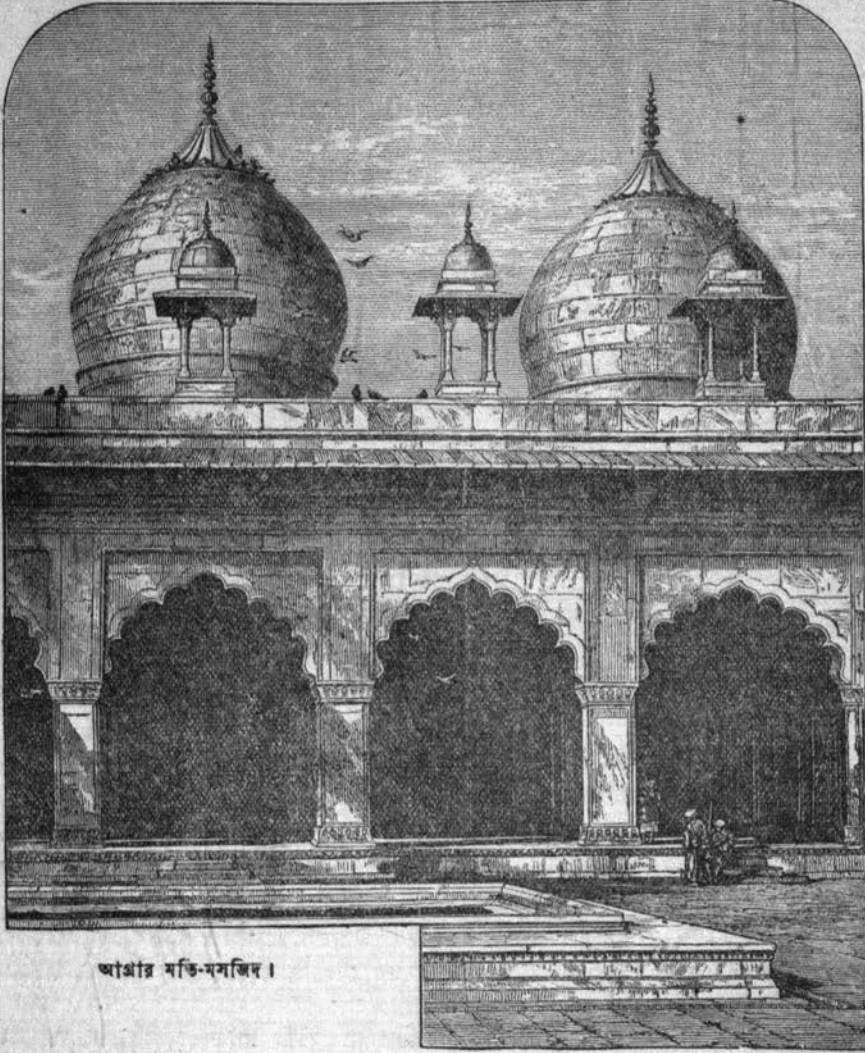
আগ্রার মতি-মসজিদ।

মথুরা।—আগরা হইতে ২০ ক্রোশ উজানে যমুনার পশ্চিম তীরে এই নগর স্থাপিত। মথুরা হইতে দেড় ক্রোশ উজানে বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের চারি দিকে ৮৪ ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থানকে ব্রজমণ্ডল বলে। ভারতবর্ষের মধ্যে এটী অতি বিখ্যাত তীর্থস্থান। এই বৃন্দাবনের মাঠে কৃষ্ণ ধেনু চরাইতেন; এবং ষোল সহস্র গোপিনীর সহিত এই বনে রাস লীলা করিতেন। কিছু কাল এই নগরে বৌদ্ধগণের প্রাদুর্ভাব হয়। মহম্মদ গিজনী একবার এই নগর লুঠ পাট করেন। আর অনেক মুসলমান রাজা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এখানকার দেবালয় ও বিগ্রহ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ১৭৫৬ সালে এক বার পর্ব্ব সময়ে মথুরায় বহুসংখ্যক যাত্রী সমাগত হয়, এমন সময়ে ২৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আহম্মদ শা আবদালি উপস্থিত হন। তাহারা গৃহবাসী সমেত গৃহ দগ্ধ করে, যুবক যুবতী, স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়, আর সকলকে বধ করে। তাহারা মন্দিরের মধ্যে গোবধ করিয়া তাহার রক্ত বিগ্রহের উপরে ছড়াইয়া দেয়।

মথুরা ও বৃন্দাবনে বৈষ্ণবদিগের অনেক দেবালয় ও বিগ্রহ আছে। কৃষ্ণ বিষ্ণুর এক অবতার—কিন্তু ইহাঁকে ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষের অবতার বলিলেই ঠিক হয়।
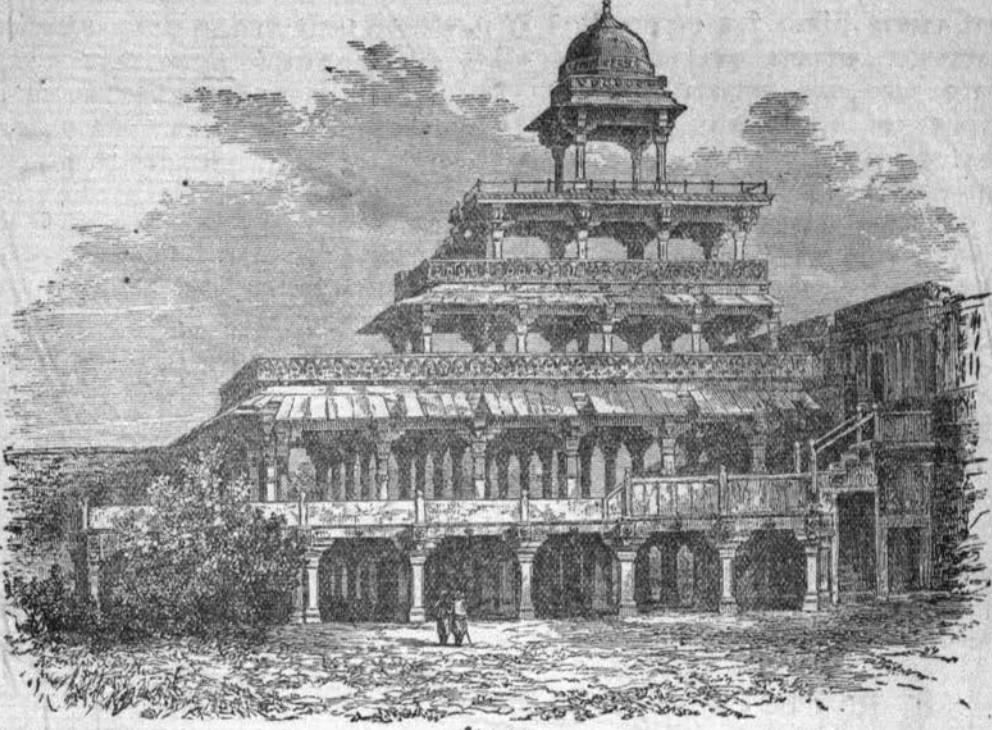
পাঁচ মহল।

## রাজপুতানা।

আগ্রার পশ্চিমে ও পাঞ্জাবের দক্ষিণে রাজপুতানা নামে এক অতি বৃহৎ অঞ্চল আছে। এই অঞ্চলে ১৮টী ছোট ছোট করদ রাজ্য ও দেশের মধ্যস্থলে একটী ব্রিটিশ রাজ্য আছে। রাজপুতানা দীর্ঘ প্রস্থে প্রায় মান্দ্রাজ রাজধানীর সমান। নিবাসীসংখ্যা এক কোটি। আর্ব্বলী পর্ব্বত মধ্যস্থলে থাকাতে রাজপুতানা দেশটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পশ্চিম ভাগের অনেক স্থান বালুকাময় মরুভূমি, মধ্যে মধ্যে বালুকার গিরি আছে। জোরে বাতাস বহিলে সে গুলি আবার সরিয়া যায়। অনেক স্থলে দেড় শত হইতে দুই শত ফুট গভীর কূপ আছে। দেশের অন্যান্য অংশ কিয়ৎপরিমাণে উর্ব্বর।

রাজপুত।

রাজপুতেরা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, ফলে কিন্তু অনেকেই জাঠ ও অন্যান্য জাতীয়। হণ্টার সাহেব বলেন, "অনেক দূরবর্ত্তী অঞ্চলে আমাদের চক্ষের উপরেই, অনেক অনার্য্য জাতীয় রাজা ও যুদ্ধপ্রিয় লোকেরা আর্য্য ক্ষত্রিয় হইয়া গিয়াছে।" প্রচলিত ভাষা হিন্দি। এ দেশে মুসলমান বড় কম। টঙ্কের নবাব ব্যতীত আর সকল রাজাই হিন্দু।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজপুতেরা বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। ইহাদের অসমসাহসিকতার

কথা সকলেরই বিদিত। কিন্তু শেষকালে প্রায়ই ইহারা অহিফেণের নেশার ঝোঁকে যুদ্ধ করিত। সেই অহিফেণই রাজপুতগণের সর্ব্বনাশের মূল। অহিফেণসেবন অতিশয় প্রচলিত। পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোক সহমরণ যাইত, ও লোকে অনেক স্থলে কন্যাসন্তান সূতিকাগৃহেই মারিয়া ফেলিত। বিবাহে এত ব্যয়বাহুল্য হয় যে, সেই ব্যয়ভার বহন করিতে যাহারা অক্ষম, তাহারাই কন্যাসন্তান মারিয়া ফেলিত। যুদ্ধ ঘটনার এত বাহুল্য ছিল যে, অতি অল্প কাল পূর্ব্বেও লোকে সশস্ত্র হইয়া চলিত। দেশের নানা অঞ্চলে ভিল ও মিনা ইত্যাদি আদিম জাতীয় লোক আছে।

মুসলমানেরা রাজপুতগণের ক্ষমতার অনেক লাঘব করিয়া ফেলিয়াছিল। মোগল ক্ষমতার অবনতি কালে রাজপুতগণের বড় দুর্দ্দশা হইয়াছিল; তখন মহারাষ্ট্রীয়গণের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, তাহারা রাজপুতানার রাজগণের নিকট হইতে কর আদায় করিত, জামিন স্বরূপ কএকটী নগর অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, এবং রাজ্যেরও অনেকাংশ কাড়িয়া লইয়াছিল।

১৮১৭ সালে মারকুইস হেষ্টিংস্ পিণ্ডারিদিগের লুঠ পাট বন্ধ করিয়া দেওয়ান, ও মহারাষ্ট্রীয়দিগকে রাজপুতানা হইতে দূর করিয়া দেন। তৎপরে সিন্ধিয়ার মহারাজা ইংরাজদিগকে আজমির প্রদেশ ছাড়িয়া দেন, এবং রাজপুতানার রাজারা সকলেই সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েন।

কএকটী বিখ্যাত স্থানের বিষয় লিখিতেছি।

## ভরতপুর।

ভরতপুর আগ্রা হইতে ষোল ক্রোশ পশ্চিমে। এই নগরের বেড় চারি ক্রোশ, নগরের চারি দিকে মাটীর দেওয়াল, প্রশস্ত ও গভীর গড়-খাই; প্রাচীরটী অত্যন্ত উচ্চ ও পুরু। গড়-খাই জলে পরিপূর্ণ। ১৮০৫ সালে লর্ড লেক ভরতপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু দখল করিতে পারেন নাই। রাজা তৎপরে সন্ধি প্রার্থনা করেন। ১৮২৭ সালে লর্ড কম্বারমোর ভরতপুর দখল করেন।

## আলোয়ার।

আলোয়ার ভরতপুরের উত্তর-পশ্চিমে। রাজধানী, বলিতে গেলে, রাজ্যটীর প্রায় ছয় শত হস্ত মধ্যস্থলে। নগর হইতে উচ্চ এক পাহাড়ের উপরে দুর্গ স্থাপিত। পাহাড়ের গোড়ায়ই রাজবাটী, রাজবাটীর ছাতে উঠিলে চারি দিকের দৃশ্য অতি মনোহর দেখায়। ১৭৭৬ শালে ভরতপুর রাজ্য হইতে এই নগরটী লওয়া হয়।

বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভে, মহারাষ্ট্রীয়-দিগের সহিত যুদ্ধ কালে আলোয়ারের মহারাজা বক্তিয়ার সিংহ ইংরাজদিগের সাহায্য করেন। আলোয়ার নগরের পূর্ব্ব দিকে, ৮॥ ক্রোশ দূরে, লাশওয়ারি নামক স্থানে ভয়ানক যুদ্ধ হয়, তাহাতে সিন্ধিয়ার সৈন্যগণ লর্ড লেক কর্ত্তৃক পরাজিত হয়।
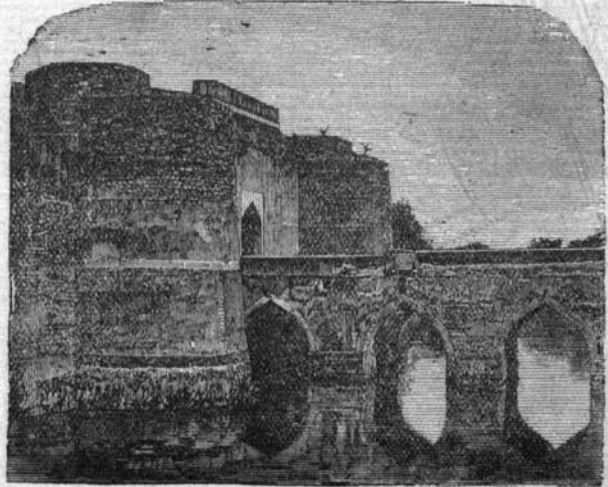
ভরতপুরের দুর্গদ্বার।

## জয়পুর।

আলোয়ারের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে জয়পুর, রাজপুতানার মধ্যে এমন সমৃদ্ধিশালী দেশ আর নাই। রাজধানীর নাম জয়পুর, ভারতবর্ষে এমন সুন্দর নগর অল্পই আছে। জয়পুর হইতে আম্বীর একটু দূরে, এক কালে এই খানে রাজধানী ছিল। গত শতাব্দীতে জয় সিংহ আম্বীর নগর ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান নগরে আইসেন। কথা আছে যে, এক নগরে ছয় শত বৎসরের অধিক কাল রাজপুত রাজবংশের বাস করিতে নাই; এই জন্য জয় সিংহ আম্বীর ত্যাগ করেন। বর্ত্তমান নগর তাঁহারই স্থাপিত ও তাঁহারই নামানুসারে নগরের নাম জয়পুর হইয়াছে। নগরের মধ্যস্থলে রাজবাটী। নগরের পথ ঘাট সুশৃঙ্খলাযুক্ত, ও প্রশস্ত,
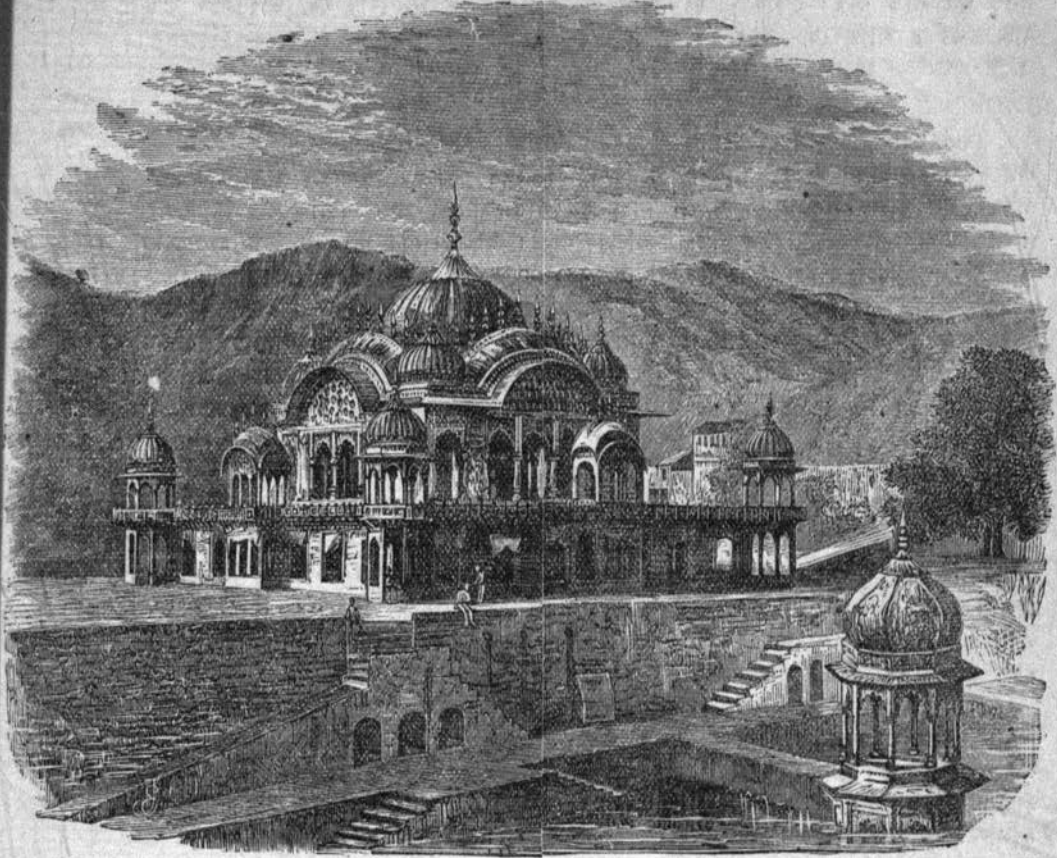
বক্তিয়ার সিংহের সমাধি।

মন্দির, মসজিদ এবং লোকের বাসগৃহ গুলি পরম সুন্দর। নগরের বাটী গুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত, বড় বড় রাস্তা প্রস্তরময় ও গ্যাসের আলোকে নগর আলোকিত।

রাজা জয় সিংহ বিখ্যাত জ্যোতিষী ও গণিত শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার নির্ম্মিত জয়পুরের মানমন্দির অতি চমৎকার; তিনি পাঁচটী মানমন্দির নির্ম্মাণ করান, তন্মধ্যে জয়পুরের মানমন্দিরটী সর্ব্বপ্রধান।

নগর মধ্যে একটী কলেজ, একটী চিত্রশালিকা ও আরও অনেক বড় বড় বাটী আছে।

স্বয়ম্বর হ্রদ।—জয়পুরের পশ্চিমে স্বয়ম্বর হ্রদ; এই হ্রদ হইতে প্রতি বৎসর ৯ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাজপুতানা অঞ্চলে এই লবণেরই অধিক ব্যবহার।

## আজমির।

আজমির আগ্রার পশ্চিমে, রেলপথে ২৩৬ মাইল। তারাগড় নামক পর্ব্বতের নিম্নস্তর পর্ব্বতাঞ্চল এই রাজ্যভুক্ত, পর্ব্বতের উপরে অতি উচ্চ এক দুর্গ আছে। নগরের চারি দিকে প্রস্তরময় প্রাচীর, তাহার পাঁচটী দ্বার। রাস্তা গুলি অতি পরিষ্কার, দুই পার্শ্বে অনেক সুন্দর সুন্দর বাটী। এই রূপ জনশ্রুতি যে, ১৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এই নগর স্থাপিত হয়। নগর-প্রাচীরের বহির্ভাগে আকবর এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। জাহাঙ্গিরের রাজত্ব কালে কএক বৎসর কাল আজমিরে মোগল রাজধানী ছিল। গত শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয়েরা আজমির অধিকার করে, এবং ১৮১৮ সাল পর্য্যন্ত তাহাদেরই হস্তগত ছিল, শেষে সিন্ধিয়ার মহারাজা ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দেন।

পুষ্কর হ্রদ।—আজমির হইতে কএক ক্রোশ দূরেই পুষ্কর হ্রদ। কথিত আছে যে, ব্রহ্মা এই হ্রদের তীরে এক যজ্ঞ করেন, তাহাতে এই হ্রদ এমন পুণ্য স্থান হইয়াছে যে, ইহার জলে স্নান করিলে পাপাধম

জনও স্বর্গ লাভ করে। ব্রহ্মার নামে এখানে একটী মন্দির আছে, বোধ হয়, ভারতবর্ষে ব্রহ্মার আর মন্দির নাই। কথিত আছে যে, কোন দুষ্কার্য্য হেতু দেবতারা ব্রহ্মার পূজা রহিত করিয়া দিয়াছেন।

## মেয়ারওয়ারা।

মেয়ারওয়ারা পর্ব্বতময় প্রদেশ, আজমির জিলার দক্ষিণ পশ্চিমে। কএক শতাব্দী কাল এ প্রদেশের লোকেরা দস্যুবৃত্তি করিয়া খাইত, পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের লোকেরা ইহাদের ভয়ে সশঙ্কিত থাকিত। ইহারা অসভ্য, দল বাঁধিয়া নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে গিয়া লুঠ পাট করিত; এমন চালাক যে, বিপদ দেখিলেই দ্রুতপদে পলাইয়া আপনাদের আড্ডায় গিয়া আশ্রয় লইত। রাজপুতানার বড় বড় রাজারা মেয়ারিদিগকে জব্দ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াও সফল হন নাই, বরং সময়ে সময়ে অনেক ক্ষতি সহ্য করিয়াছেন। রাজপুতেরা কখনও কখনও মেয়ারিদিগের কোন দুর্গ অধিকার করিত, বা কোন গ্রাম জ্বালাইয়া দিত, কিন্তু কোন সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ পরাজয় করিতে পারে নাই; এদিকে তাহারা ছিদ্রান্বেষণে থাকিত, ছিদ্র পাইলেই লুঠ পাট করিয়া চলিয়া যাইত। ইহাদের অনেকেই অন্যান্য রাজ্যের পলাতক লোক, ডাকাইতি করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। মনুষ্যের জীবন ও মনুষ্যের স্বাধীনতা তাহারা তৃণবৎ জ্ঞান করিত। আপনাদের কন্যা-সন্তান মারিয়া ফেলিত, মাকে পর্য্যন্ত টাকার জন্য বিক্রয় করিত, ফলে যত নৃশংস কার্য্য, তাহাই করিত; তাহাতে লজ্জা বা দুঃখ বোধ করিত না।

যখন এই দেশ ইংরাজদিগের হস্তগত হয়, তখন সশস্ত্র লোকেরা নানা স্থানে বেড়াইয়া বেড়াইত, এবং পাহাড়ে ও পথের মোড়ে চৌকি দিত। রাজকর্ম্মচারীদিগের দেশের মধ্যে প্রবেশ করিবার যো ছিল না; জেলখানার কয়েদীদিগকে ডাকাইতেরা ছাড়িয়া দিয়াছিল। রাজপথে নিরাপদে চলিবার যো ছিল না। কাপ্তান হাল্ নামক এক জন ইংরাজ গবর্ণমেন্টের এজেন্ট হইয়া গিয়া মেয়ারিদিগকে সৈন্যদলভুক্ত করত এক পল্টন খাড়া করেন। শিক্ষার গুণে তাহারা উত্তম এবং বিশ্বাসী সিপাহী হইয়া উঠে। ইহাদিগেরই দ্বারা ডাকাইতের দল নির্ম্মূল হয়।

মেয়ারিদিগের বিচারবিতরণের ভাবটা কিন্তু চিরকালই সে কেলে ধরণের ছিল। দুই জনে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে আত্মীয় বন্ধুজন লইয়া তরোয়াল দিয়া কাটা কাটি করিত; এই প্রকার বিবাদ পুরুষপুরুষানুক্রমে চলিত। অথবা কোন ব্যক্তির উপর দোষারোপ হইলে, তপ্ত তৈলে হাত ডুবাইয়া দিয়া, বা তপ্ত লৌহ-শলাকা হাত দিয়া ধরিয়া আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে হইত। কাপ্তান হাল পঞ্চায়েত স্থাপন করেন; কেবল গুরুতর অপরাধের বিচার তিনি নিজে করিতেন।

কিন্তু ইহাদিগকে সভ্য করিবার প্রধান উপকরণ লাঙ্গল। ১৮৩৫ সালে কাপ্তান ডিক্সন্ হাল সাহেবের পদ পান। এত কাল জমির অবস্থা এমন কদর্য্য ছিল যে, কেহ ভূসম্পত্তির উপার্জ্জন করিতে চাহিত না। বৃষ্টি পাতের নিশ্চয়তা ছিল না। তায় আবার দেশটী পর্ব্বতময়; ধরিয়া রাখিতে না পারিলে বৃষ্টির জল দু দিকে সরিয়া যাইত। উপত্যকা দিয়া বাঁধ বাঁধিয়া কূপ খনন করিয়া, এবং পুষ্করিণী কাটিয়া দেওয়াতে জলকষ্ট অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। লোকদিগকে টাকা আগাম দিয়া কৃষিকার্য্য করিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। ইহাতে কিছু দিনের মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যবসাদার ডাকাইত পরিশ্রমশীল কৃষক হওয়াতে দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

অতঃপর ডিক্সন্ সাহেব এই দেশে ব্যবসায়ী লোকদিগকে লইয়া গিয়া বসতি করাইতে চেষ্টা পান। তিনি একটী নগর স্থাপন করেন, তাহার নাম রাখেন "নয়া নগর"। মেয়ারিরা প্রথমে এই নগর স্থাপনের উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারে নাই; ভাবিয়াছিল, এ বুঝি নূতন কর আদায় করিবার জন্য কোন ফিকির হইতেছে। দোকানদারদিগের প্রাণে ভয় ছিল, পাছে, মেয়ারিরা আসিয়া লুঠ পাট করে। তাই তাহাদিগের অনুরোধে নগরের চারি দিকে প্রাচীর নির্ম্মিত হয়। অতি অল্প দিনের মধ্যে নয়া নগরে প্রায় বিশ হাজার পরিবার গিয়া বাস করে।

১৮২৭ সালে কাপ্তান হাল রিপোর্ট করেন যে, মেয়ারিরা আপনা হইতে স্ত্রীলোক বিক্রয় ও শিশু কন্যা হত্যা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। দেশটী এক্ষণে এরূপ নিরাপদ হইয়াছে যে, মেয়ারিরা পর্ব্বত পার্শ্বস্থ নিভৃত স্থান পরিত্যাগ করিয়া, সমতল নিম্নভূমিতে আপনাদের ক্ষেত্রের নিকটে ঘর তুলিয়া বাস করিতেছে। অসভ্য ডাকাইতেরা এক্ষণে সভ্য গৃহস্থ হইয়াছে। তাহাদিগের সুস্থ শরীর, প্রফুল্ল বদন ও উত্তম বেশ ভূষণ দেখিলেই জানা যায় যে, সৌভাগ্যের বৃদ্ধি হইতেছে।

মেয়ারওয়ারা দেশে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট প্রজার মঙ্গলার্থ যে প্রকার যত্ন করেন, যদি জমিদারেরা রাইয়ত-দিগের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তদ্রূপ যত্ন করিতেন, কোন্ কালে বঙ্গদেশের শ্রী ফিরিত।

## পদ্মিনীর উপাখ্যান।

আজমির-মেয়ারওয়ার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে উদয়পুর বা মেওয়ার নামে এক রাজপুত রাজ্য আছে। সূর্য্যবংশীয় জ্যেষ্ঠ শাখার বংশধর বলিয়া উদয়পুরের রাণাবংশের বড় মান। হিন্দুরা রাণাকে রামচন্দ্রের প্রতিনিধি বলিয়া মানে। উদয়পুরের রাণারা যেরূপ সাহস সহকারে দীর্ঘকাল মুসলমানদিগের গতি রোধ করিয়াছেন, তেমন আর কেহ করিতে পারে নাই। অত্রত্য রাজবংশীয়গণের একটী বিশেষ অহঙ্কারের বিষয় এই যে, তাঁহারা কখনও মুসলমান সম্রাটগণকে কন্যাদান করেন নাই। এক জন রাণা এবং তাঁহার পরমা সুন্দরী রাণীর বিষয়ে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে।—

খিলিজি বংশীয় আলা-উদ্দিন ১২৯৪ সালে দাক্ষিণাত্য অধিকার করেন, ইতিপূর্ব্বে কোন মুসলমান সম্রাট দাক্ষিণাত্য অধিকার করিতে পারেন নাই। চিতোরের রাণা ভীমজির রাণী পদ্মিনীর রূপ লাবণ্যের প্রশংসা শুনিয়া, ইনি তাঁহাকে চাহেন। রাণা অসম্মত হওয়াতে, আলা-উদ্দিন বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া আসিয়া চিতোর নগর ঘিরিয়া থাকাতে রাণা বড়ই বিপন্ন হয়েন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি নগর হস্তগত করিতে অসমর্থ হয়েন। অনন্তর তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, যদি পদ্মিনীর মূর্ত্তি আমি আয়নাতে দেখিতে পাই, তাহা হইলেই সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যাইব। রাণা সম্মত হইলেন, এবং পদ্মিনীর মূর্ত্তিও সম্রাটকে দেখাইলেন। গমন কালে রাণা ভদ্রতা রক্ষার্থ সঙ্গে সঙ্গে শিবিরের সীমানা পর্য্যন্ত গেলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক আলা-উদ্দিন তাঁহাকে নিজ হাতে পাইয়া বন্দী করিয়া রাখিলেন, আর বলিলেন, যদি পদ্মিনীকে না আনিয়া দেও, তোমাকে বধ করিব। এই শুনিয়া পদ্মিনী কহিলেন, "আমি গিয়া বাদশার স্ত্রী হইব, তবু স্বামীকে বাঁচাইব।" তদনুসারে তিনি যবনশিবিরে যাত্রা করিলেন, এবং বহুসংখ্যক সাহসী যোদ্ধাকে নারীবেশে সঙ্গে লইলেন। আলা-উদ্দিন মনে করিলেন, ইহারা রাণীর দাসী, তাই অবাধে শিবিরে প্রবেশ করিতে দিলেন। রাণা রাণীর নিকট বিদায় লইতে গেলে নারী বেশধারী যোদ্ধারা রাণী ও রাণাকে লইয়া দ্রুতগতি অশ্বে আরোহণ করত দেখিতে না দেখিতে যবনশিবির ত্যাগ করিয়া চিতোর নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্রাট পুনরায় আরও অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আবার আসিয়া চিতোর আক্রমণ করিলেন। রাণা আবার বড় বিপদে পড়িলেন, এক দিন স্বপ্নে দেখিলেন, কেহ আসিয়া যেন বলিতেছেন, রাজবংশীয় দ্বাদশ জন লোক প্রাণদান না করিলে নগরের সকলকেই হত হইতে হইবে। রাজার দ্বাদশটী পুত্র ছিল, পিতার সহিত নগর রক্ষার্থে তাঁহারা সকলেই প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইলেন। তদনুসারে একাদশ দিনে একাদশটী পুত্রকে বধ করা হইল, একটী মাত্র অবশিষ্ট রহিল। এই রাজকুমারকে রাণা বড়ই ভাল বাসিতেন, কোন মতেই বধ করিতে দিতে চাহিলেন না। পুত্রকে কহিলেন, তুমি পালাও, আমি তোমার বদলে প্রাণ দিব।

রাজপুতদিগের সমাজে এক ভয়ানক রীতি প্রচলিত ছিল; পুরুষেরা যুদ্ধ করত শত্রুকে পরাজয় করিতে না পারিলে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে বধ করিয়া শেষে সকলে মিলিয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করত সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিত। চিতোর নগরে কএকটা প্রকাণ্ড গুহা ছিল। রাণার আদেশমতে তাহাতে অগ্নিকুণ্ড করা হইলে বহুসহস্র স্ত্রীলোক লইয়া পদ্মিনী তাহাতে প্রবেশ করিলেন। গুহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে স্ত্রীলোকেরা পুড়িয়া ভস্ম হইল। অনন্তর রাণাও প্রাণদান করিলেন। তখন দুর্গের দ্বার খুলিয়া যোদ্ধারা বাহির হইল, প্রত্যেকের ঘোড়ার মস্তকে মৃত স্ত্রী বা আত্মীয় জনের বস্ত্রখণ্ড বাঁধা। যোদ্ধারা সকলেই হত হইল।

নিরাশ আলা-উদ্দিন নগরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, পদ্মিনীর সহিত সমস্ত সুন্দরী স্ত্রীলোক হত হইয়াছেন। ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া তিনি নগরবাসিদিগের উপর অতি নিষ্ঠুর রূপে অত্যাচার করেন। আজি পর্য্যন্ত সেই সকল গুহার মুখ বন্ধ রহিয়াছে, রাজপুতেরা এই সকল স্থানকে অতি পবিত্র জ্ঞান করে।

---

## পাঞ্জাব।

পাঞ্জাব ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম দিকে। এই দেশের ভূমির পরিমাণ ৮০,০০০ বর্গ ক্রোশ, সুতরাং উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও অযোধ্যার তুল্য। পাঞ্জাবের উত্তর ও পশ্চিমপ্রান্ত পর্ব্বতময়। কিন্তু এদেশের অধিকাংশ ভূমি সমতল, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ক্রমে নিম্ন হইয়া গিয়াছে। সিন্ধুনদ, ও তাহার সহিত আর যে পাঁচটী নদী একই প্রণালী দিয়া সিন্ধুর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, সেই সকলের দ্বারা এই দেশ সিক্ত হয়। লোক সংখ্যা এক কোটী নব্বই লক্ষ। এ দেশের ভাষাকে পাঞ্জাবি বলে, অনেকটা হিন্দির মত। হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষাও প্রচলিত দেখিতে পাই, সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরবর্ত্তী আফগানদিগের ভাষা পস্তু।

সিকন্দর ও পুরু।

ইতিহাস।—এই দেশ দিয়া সে কালে আর্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। পারসিকেরাও এই দেশের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিল। খ্রীষ্ট জন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে মহান্ সিকন্দর এই দেশ অধিকার করেন। এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে তিনি পুরু নামক রাজাকে পরাজয় করেন। আহত রাজা সিকন্দর শাহার নিকট আনীত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমার নিকট কিরূপ ব্যবহার চাহেন?" রাজা উত্তর করিলেন, "রাজার মতন."। সিকন্দর শাহা এই উত্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। সৈন্যগণ আর অধিক দূর যাইতে অসম্মত হওয়াতে সিকন্দর ঝিলমনদী দিয়া আফ্‌গানীস্থান হইয়া পারস্য দেশে প্রত্যাগমন করেন। পর শতাব্দীতে মগধের বৌদ্ধ রাজা অশোক পাঞ্জাবদেশ অধিকার করেন।

কুতুব মিনার।

সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানেরা পাঞ্জাবে লুঠ আরম্ভ করিয়া পরিশেষে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশ হস্তগত করে। ১৬৭৫ সালে গুরুগোবিন্দ নামক এক ব্যক্তি শিখদিগকে লইয়া সামরিক সমিতি স্থাপনের অভিপ্রায় করেন। ১৭৮০ সালে রণজিৎ সিংহের জন্ম হয়, ইহাঁর বীরত্বপ্রভাবে শিখ জাতির চূড়ান্ত বাহুবল হয়। আফগান রাজারা রণজিৎ সিংহকে লাহোরের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন। ইউরোপীয় সেনাপতিগণের অধীনে স্বজাতীয় শিখসৈন্য সংগ্রহ করত রণজিৎ সিংহ ক্রমে ক্রমে সমস্ত পাঞ্জাব ও কাশ্মীর অধিকার করেন। ১৮৩৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র খরক সিংহ সিংহাসন প্রাপ্ত হন, কিন্তু পর বৎসর তাঁহার মৃত্যু হয়,——লোকে বলে, কেহ তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়াছিল। রাজানুচরদের মধ্যে অনৈক্য উপস্থিত হওয়াতে দেশটী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল; ইউরোপীয় সেনাপতিরা পদচ্যুত হইলেন, এবং সৈন্যগণ অবাধ্য হইল। ১৮৪৫ সালে বহুসংখ্যক শিখসৈন্য আসিয়া ইংরাজ রাজ্যের কতকটা অধিকার করাতে চারিটী ভয়ানক যুদ্ধ হইল, শেষ যুদ্ধের পরে পরাজিত হইয়া, শিখেরা শতদ্রু নদীর পরপারে গেল। শিখরাজ্যের কতকটা ইংরাজেরা দখল করিল এবং রণজিৎ সিংহের শিশু পুত্র দলীপ সিংহকে রাজা বলিয়া স্বীকার করা হইল। ১৮৪৮ সালে শিখেরা দুই জন ইংরাজ কর্ম্মচারিকে হত করিল। আবার শিখেরা ক্ষেপিয়া উঠিল। দুইটী ভয়ানক যুদ্ধের পর ১৮৪৯ সালে সমস্ত পাঞ্জাব ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইল,——দলীপ সিংহ পেন্‌সন পাইলেন।

১৮৫৮ সালে দিল্লী অঞ্চল পাঞ্জাবভুক্ত হয়, এক জন ছোট লাট এই দেশের শাসনকর্ত্তা।

দিল্লী হইতে আরম্ভ করিয়া কএকটী প্রধান নগরের বর্ণন করিব।

## দিল্লী।

দিল্লী যমুনার পশ্চিম তীরে, কলিকাতা হইতে রেল পথে ৪৭৭ ক্রোশ। ভারতবর্ষের মধ্যে দিল্লী অতি প্রাচীন নগর।

ইতিহাস।—দিল্লী নগরের চতুষ্পার্শ্বে কেবল বাড়ীভাঙ্গা ইট পাথর পড়িয়া আছে। অতি প্রাচীন কালে আর্য্যেরা এই খানে থাকিয়া ভারতে সভ্যতা বিস্তার করেন। ভারতের প্রাচীন নগর সকলের নাম করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ইন্দ্রপ্রস্থের নাম করিতে হয়। মহাভারতে লিখিত আছে যে, গঙ্গাতীরবর্ত্তী হস্তিনাপুর নগর ত্যাগ করিয়া, পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতায় ইন্দ্রপ্রস্থ নগর নির্ম্মাণ করেন, কালক্রমে ইহা ভারতের রাজধানী হইয়া উঠে। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির এই নগরের স্থাপনকর্ত্তা; ইহাঁর পরবংশীয়েরা ৩০ পুরুষ পর্য্যন্ত এই খানে রাজত্ব করেন। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের ইতিহাসে দিল্লী নগরের নামোল্লেখ পাওয়া

সাবেক দিল্লীর ফটক।

যায়। ইহার পরেও কএকটী হিন্দু রাজবংশ এই নগরে থাকিয়া রাজত্ব করেন। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে ধব নামে এক রাজা, দিল্লীর লৌহস্তম্ভ স্থাপন করেন; স্তম্ভটীর বেড় ১৬ ইঞ্চি ও উচ্চতা ৫০ ফুট। পরে দিল্লী নগর বহুকাল ধ্বংস অবস্থায় থাকে, শেষে ৭৩৬ সালে অনঙ্গপাল উহার পুনঃস্থাপন করেন। তাঁহার অনেক পরবর্ত্তী রাজারা, বোধ হয়, কনৌজ নগরে বাস করিতেন। ১১৯৩ সালে মহম্মদ ঘোরি পাণিপথের যুদ্ধে পৃথ্বী রাজকে পরাজয় এবং হত করেন। মহম্মদ ঘোরি কুতুবুদ্দিন নামক এক জন সেনাপতিকে নবাধিকৃত দেশের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া চলিয়া যান। ইনি দিল্লী নগরে অবস্থান করত, নগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও নিজে মূলতঃ দাস হইলেও এক ক্ষমতাশালী রাজবংশ স্থাপন করিয়া যান। পুরাতন দিল্লী ইহাঁর কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী। কুতুব-মিনার ২৩৮ ফুট উচ্চ, ইহাও কুতুবুদ্দিনের নির্ম্মিত। ১৮০৩ সালে ভূমিকম্প হওয়াতে ইহার চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। এটী নগর হইতে দক্ষিণ দিকে পাঁচ ক্রোশ দূরে।
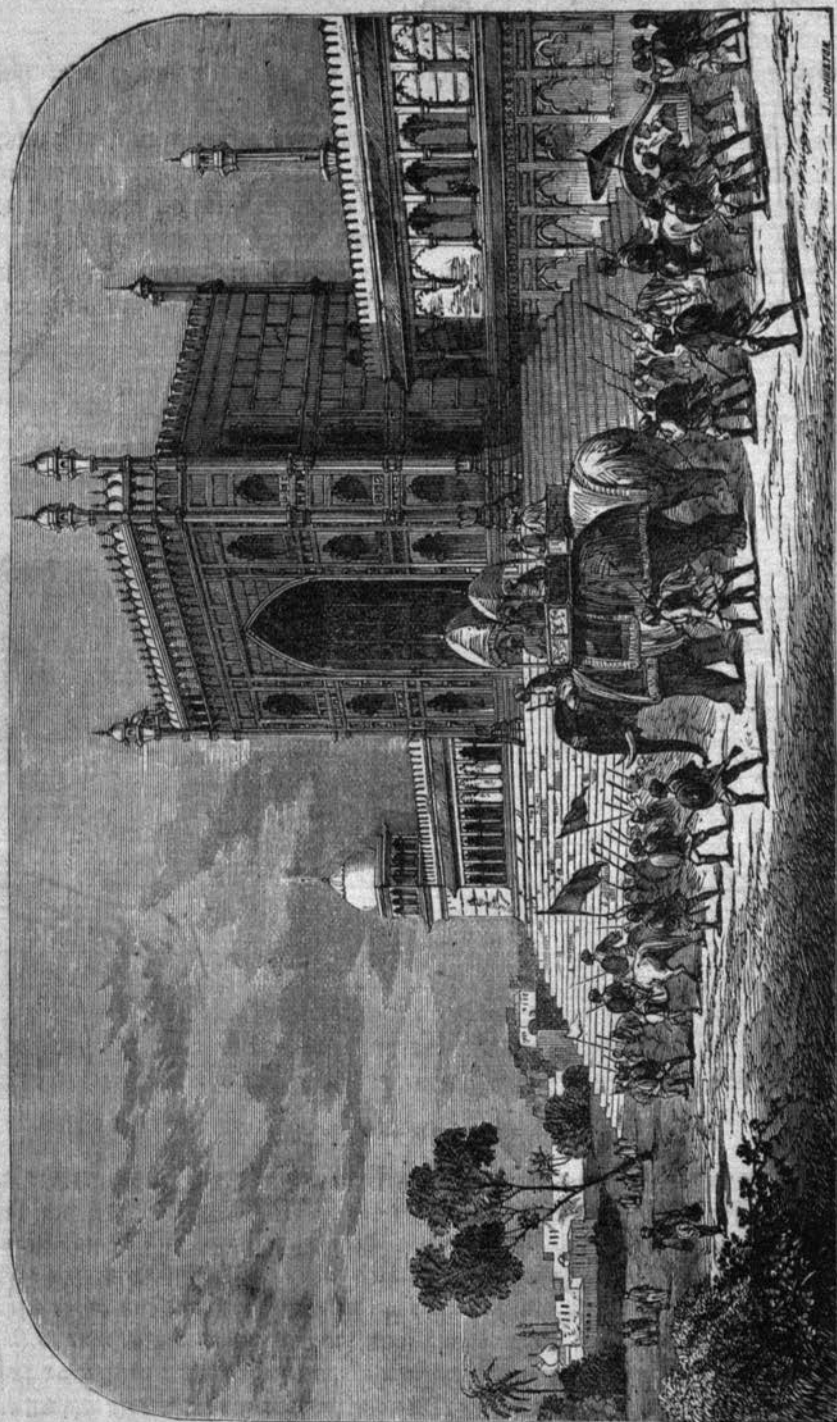
মসজিদের দ্বার—দিল্লী।
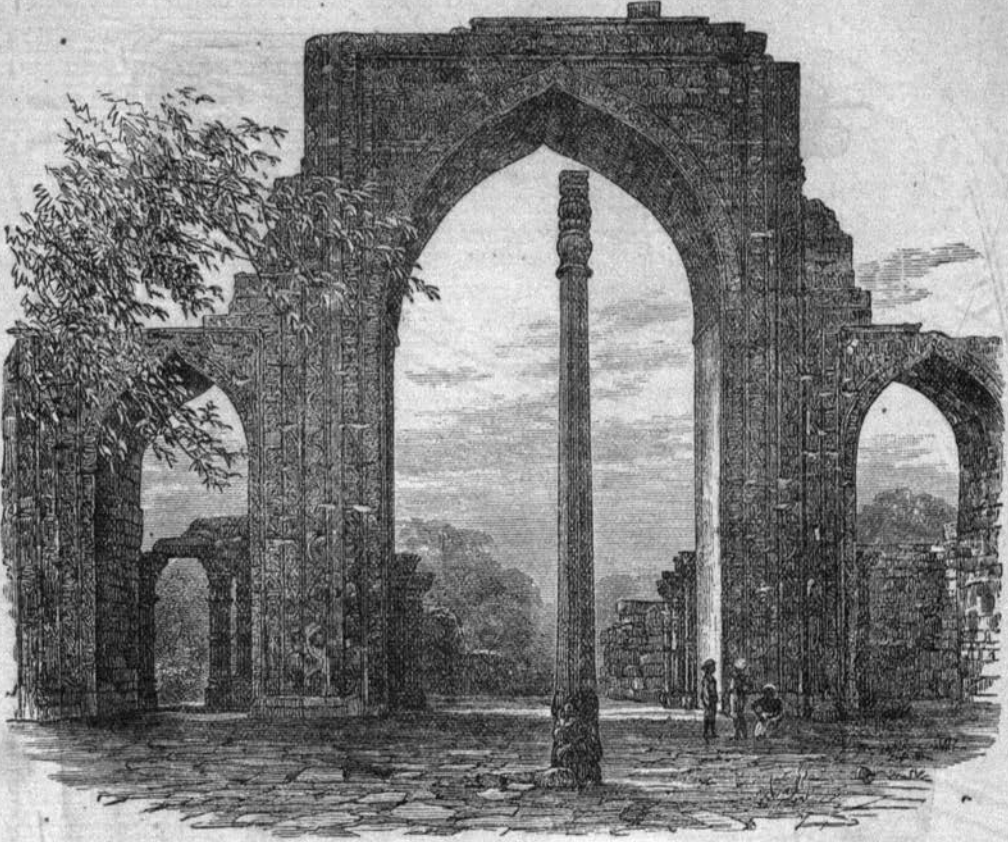
লোহস্তম্ভ—দিল্লী।

তোগলক রাজবংশের স্থাপনকর্ত্তা গিয়াসুদ্দিন পূর্ব্ব দিকে দুই ক্রোশ দূরে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া, তাহার নাম তোগলকাবাদ রাখেন। এখানে এখন লোকের বসতি নাই, বাড়ী ভাঙ্গা ইট পাথর স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। তৎপুত্র মহম্মদ তোগলক দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি নামক স্থানে সমস্ত নিবাসিদিগকে লইয়া যাইবার জন্য তিন বার চেষ্টা করেন।

তৈমুর বা তামার লেনের ভারতবিজয়বৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।——

বহুসংখ্যক তাতার সৈন্যদল লইয়া তৈমুর ১৩৯৮ সালে ভারতবর্ষে আইসেন। দিল্লী নগরের প্রাচীরের নিকটেই তিনি মহম্মদ তোগলককে পরাজিত করিয়া, রাজধানীতে প্রবেশ করেন। বিজয়ী তৈমুরের অনুমতিক্রমে তদীয় সৈন্যগণ পাঁচ দিন নগর লুঠ পাট ও নগরবাসিদিগকে বধ করে; এদিকে তৈমুর বন্ধু বান্ধবসহ আমোদ প্রমোদ করেন। কোন কোন রাস্তায় এত মৃতদেহ পড়িয়াছিল যে, মানুষের চলাচল বন্ধ হইয়াছিল। নিবাসিদিগের অনেকে পলাইয়া পুরাতন দিল্লী নগরে গিয়া আশ্রয় লয়। এক জন মুসলমান ইতিহাসলেখক বলিয়াছেন, তৈমুরের সৈন্যগণ পলাতক লোকদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, "ঐ সকল নাস্তিকের আত্মা নরককুণ্ডে নিক্ষেপ ও দেহ ভক্ষ্যার্থে পশু পক্ষিদিগকে দান এবং তাহাদের মস্তকদ্বারা স্তূপ নির্ম্মাণ করে।" ইহার পরে তৈমুর সসৈন্যে মিরাট দখল করেন। উক্ত মুসলনান লেখক বলেন, "তাহারা এই স্থানের লোকদিগকে জীবন্ত তাড়াইয়া দিয়া, তাহাদের স্ত্রী পুত্রগণকে দাস করিয়া লইয়া যায়; এবং আগুন দিয়া সমস্ত পোড়াইয়া ফেলে, ও নগরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া নগরটী ভস্মাবশেষ করিয়া যায়।"

১৫২৬ সালে, তৈমুর বংশীয় বাবর পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত করত, দিল্লী নগরে প্রবিষ্ট হয়েন; কিন্তু আগ্রা নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র হুমায়ুন দিল্লী নগরে বাস করেন; এই নগরের নিকটেই তাঁহার সমাধিস্তম্ভ; সেটী পরম সুন্দর। আকবর, ও জাহাঙ্গির সচরাচর আগ্রা, লাহোর ও

নাদির শাহের দিল্লীর হত্যাকাণ্ড দর্শন।

আজমিরে বাস করিতেন, এক্ষণে আমরা যে ভাবের দিল্লী দেখিতে পাই, শাজেহান ইহার নির্ম্মাণ করেন। ইহার চারি দিকের প্রাচীর ও ছুর্গ তাঁহারই নির্ম্মিত। রাজবাটী ও জুম্মা মস্‌জিদও তাঁহারই আমলের।

১৭৩৯ সালে পারসিক নাদের শাহ মোগল সম্রাটকে যুদ্ধে পরাস্ত করত, দিল্লী নগরে প্রবেশ করেন। ইহার ছুই দিবস পরে জনরব উঠিল যে, নাদের শাহের মৃত্যু হইয়াছে, ইহা শুনিয়া লোকেরা পারসিকদিগকে আক্রমণ করিল। শেষে নাদের শাহ, প্রধান চৌরাস্তার মাথায় দাঁড়াইয়া, নগরবাসিদিগকে হত করিতে আদেশ করেন, তাহাতে সেই দিন বৈকাল বেলা কএক ঘণ্টার মধ্যে স্ত্রীলোক, পুরুষ এ শিশু সমেত সম্ভবতঃ ত্রিশ হাজার লোক অতি নিষ্ঠুর রূপে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া হত হয়। ৫৮ দিন ধরিয়া সেনারা নগর লুট করে। নাদের শাহ সে সকল লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া যান। তাহার মূল্য অনেকে অনেক রূপ বলেন; ফলে ৯ হইতে ৩০ কোটী টাকা হইবে। সুবিখ্যাত ময়ূরাসনও তিনি লইয়া যান।

গত শতাব্দীর মধ্যে অন্যূন ত্রয়োদশ বার আফগান জাতীয় লোকেরা আসিয়া দিল্লী ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চল অধিকার করে। তাহাতে যেরূপ শোচনীয় রক্তপাত ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড হয়, এমন আর কখনও কোন দেশে হইয়াছে কি না, সন্দেহ স্থল। এক বারকার আক্রমণ কালে নিরুপায় দিল্লীবাসীরা নগরের দ্বার খুলিয়া আফগানদিগকে অতিথিরূপে গ্রহণ করে। এবার কেবল ছয় ঘণ্টা কালমাত্র নহে, কএক সপ্তাহ ধরিয়া নরব্যাঘ্র আফগানেরা নগরবাসি নিরুপায় লোকদিগের উপর অতি পাশবোচিত অত্যাচার করে। এ দিকে আফগান অশ্বারোহিরা রাজা, প্রজা, ধনী দরিদ্র, সকলকে বধ, গৃহদগ্ধ ও লুণ্ঠন করতঃ চতুর্দ্দিকবর্ত্তী অঞ্চল ছারখার করিতে থাকে। হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থস্থান ছার খার এবং তীর্থবাসী নিরুপায় লোকদিগকে বধ করা তাহাদের বিশেষ প্রিয়কার্য্য ছিল।

১৭৮৮ সালে মহারাষ্ট্রীয়েরা স্থায়ীরূপে দিল্লী নগর হস্তগত করিয়া রাখে, এবং মোগল সম্রাট সিন্ধিয়ার মহারাজার দ্বারা বন্দী হইয়া থাকেন; অবশেষে, ১৮০৩ সালে ইংরাজেরা উক্ত নগরে প্রবিষ্ট হয়েন।

এই হইতে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল দিল্লীবাসিরা নির্ব্বিঘ্নে শান্তিসুখ ভোগ করে। ১৮৫৭ সালের মে (বৈশাখ) মাসে সিপাহি বিদ্রোহকালে, মিরাট হইতে বিদ্রোহিরা গিয়া দিল্লী নগরে প্রবেশ করতঃ, নগর বাসী ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, সকলকে অতি নিষ্ঠুর রূপে হত করে। ইহার ছুই তিন মাস পরে ইংরাজেরা পুনরায় নগরটী উদ্ধার করত, বিদ্রোহিদিগের সাহায্যকারী মোগল সম্রাটকে রেঙ্গুণে নির্ব্বাসিত করেন। ১৮৭৭ সালে দিল্লী নগরে, মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতসম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

নগর।—নগরের যে অংশে দেশীয় লোকের বাস, সে অংশের অধিকাংশ বাটী ইষ্টকনির্ম্মিত হইলেও বিলক্ষণ মজবুত। রাস্তাগুলি ছোট ছোট, অতিশয় সংকীর্ণ ও বক্র। কিন্তু বড় বড় রাস্তা প্রশস্ত ও সুন্দর। চাঁদনি চকের চিত্র প্রকাশ করিলাম। এই চকের মধ্য স্থলে একসারি বৃক্ষশ্রেণী আছে।

দিল্লীর চাঁদনী চক।

রাজবাটী এক্ষণকার ছুর্গ। এটী অতি চমৎকার।—খাস-দেওয়ান নামে একটী দালান আছে; ইহা নানাবিধ কারুকার্য্যে পরিশোভিত। ছাতের চারি দিকে এই কটী কথা খোদিত "যদি পৃথিবীতে বৈকুণ্ঠ থাকে, তবে সেটী এই, সেটী এই।" ছুঃখের বিষয় এই, অনেক সময়ে ইহার নিবাসিরা বৈকুণ্ঠনিবাসিদিগের ন্যায় সাধু ছিল না।

এখানকার প্রধান মস্‌জিদের মতন সুন্দর মুসলমান উপাসনা মন্দির এদেশে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার প্রস্তরময় সোপানশ্রেণীই বা কি মনোহর! অভ্যন্তরের মেঝিয়ায় শ্বেত-প্রস্তর বসান, দলিজ ও ছাতের অভ্যন্তর-দেশও শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত।

হুমায়ুনের সমাধিমন্দির নগর হইতে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী; এটীও প্রস্তরনির্ম্মিত